কালের কথা

বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩
জুলাই ২০০৭

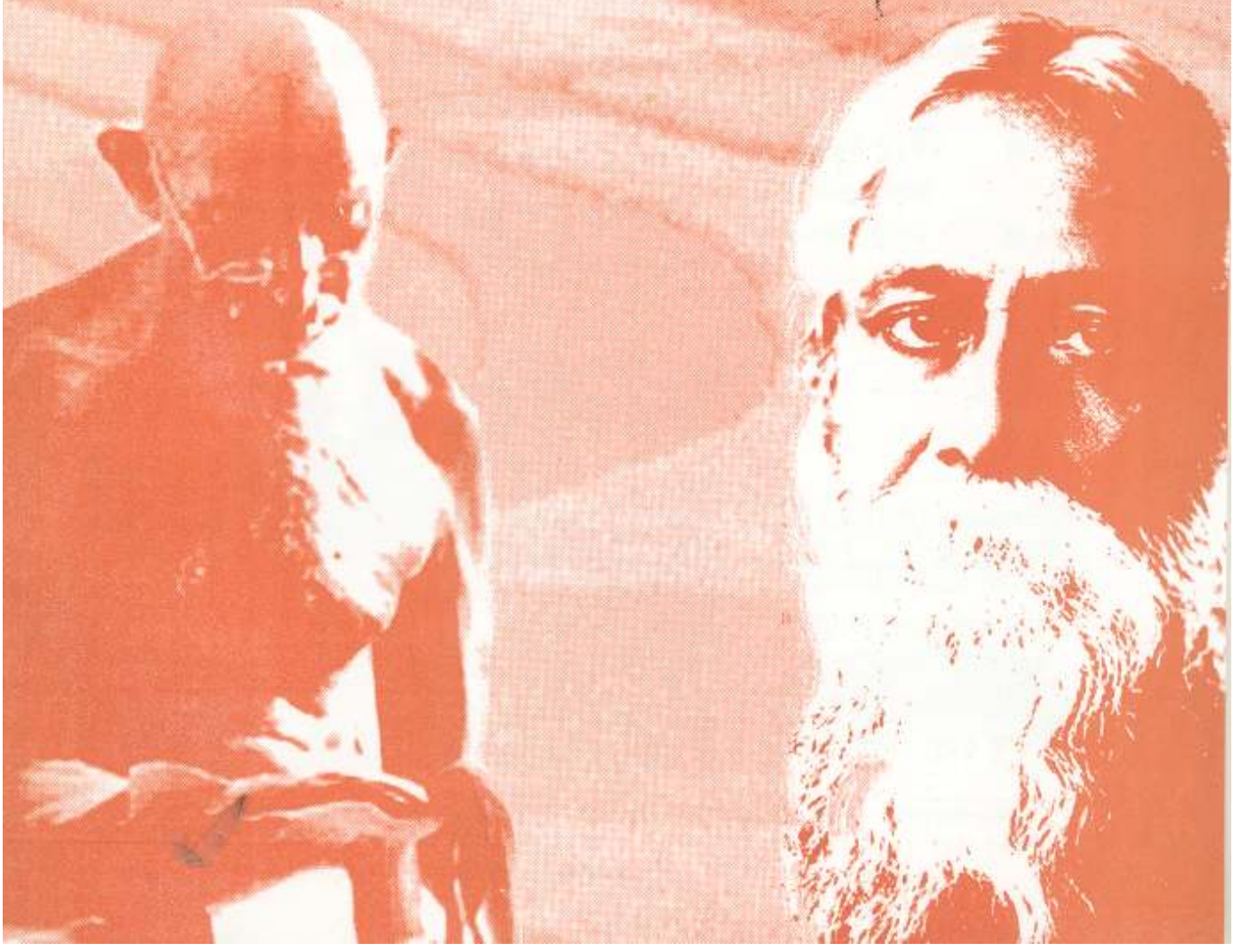

চাষের কথা

বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩ জুলাই ২০০৭

শিল্প বনাম কৃষি। এ আলোচনা আজ রাজ্য বা দেশ-এর সর্বত্র। এ নিয়ে রাজনীতিও চলছে বিস্তর। কিন্তু সত্যিই রাজনীতিটা কী, এ ধোঁয়াশা আপামর জনতার মধ্যে। এ সময়ে প্রয়োজন ফিরে দেখার। এই ফিরে দেখার জন্য, যাঁরা শুধু বক্তৃতা দেননি হাতে কলমে কাজও করছেন, এমন ২ জন মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরলাম। একই সাথে উল্লেখ করা হল ভারতের কৃষির বিবর্তন। এর সাথেই দেওয়া হল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা।

সূ . চি . প . ত্র

- গান্ধিজির দৃষ্টিতে কৃষি বনাম শিল্প ২
- রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কৃষিভাবনা ৫
- ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিণতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৯
- জৈব কৃষি মাটির জৈবিক সত্তা ১৩
- ভারতের নয়া বাদশাহী চাল ২৩
- উন্নয়ন ও পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা ২৮
- ক্ষণিকের অতিথি ৩৩

CHASER KATHA, QUARTERLY,
JULY 07
DECLARATION NO. 92/3.11.95

হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস
প্রচ্ছদ ও চিত্রণ : মানব পাল
রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগের ঠিকানা : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৪২, ফোন : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬
ফ্যাক্স : ০৩৩২৪৪২ ৭৫৬৩, E mail - drcsc@vsnl.com, Website : www.drcsc.org

গান্ধিজির দৃষ্টিতে কৃষি বনাম শিল্প

রণজিৎ চৌধুরী

ধ্রুপদী অর্থনীতির সাহিত্যে উন্নয়ন কথাটা ব্যবহার হয়নি। যে কথাটা ব্যবহার হয়েছে তা শিল্প বা শিল্পায়ন। ধ্রুপদী অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ বলেছেন শিল্প হলে জাতির (ব্যক্তির নয়) ঐশ্বর্য বাড়ে এবং ঐশ্বর্য বাড়লে জাতির শক্তি বাড়ে। অর্থনীতির উদ্দেশ্য কর্মবিভাজনের মধ্যে দিয়ে দ্রুত অনেক দ্রব্য তৈরি করা।

সত্যি কি শিল্প নতুন দ্রব্য তৈরি করে? ফরাসী দেশের আদি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা, যাঁরা ফিজিওক্র্যাট বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা মনে করতেন, শিল্প সঠিক অর্থে কোনো নতুন জিনিস তৈরি করে না। শিল্প একটা জিনিস থেকে আর জিনিসে আকার দেয় মাত্র। কাঁচা মালের রূপান্তর ঘটায় মাত্র। শিল্প নতুন দ্রব্য তৈরি করার নামে কতগুলো উপযোগ তৈরি করে। তার মাধ্যমে তারা নতুন নতুন চাহিদা তৈরি করে। যে দ্রব্য ছিল না সে দ্রব্য যখন তৈরি হয় তার জন্য নতুন চাহিদা তৈরি হয়। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে উপযোগ তৈরি হয়। বস্তুর চাহিদা নতুন বস্তু তৈরি করে এবং ওই বস্তু ঐশ্বর্য আনে। এই ঐশ্বর্য কোনো নতুন বস্তু আনে না। কাঁচা মালকে নতুন আকারে নতুন সাজে উপস্থিত করে। ফিজিওক্র্যাটরা মনে

করতেন আসলে কৃষিতেই নতুন বস্তু তৈরি হয়। যেমন নতুন করে প্রতি বছর শস্য উৎপন্ন হয়। শস্য যখন উৎপন্ন হয় নতুন করে নতুন ফসল তৈরি হয়। শিল্পে নতুন করে কোনো জিনিস উৎপন্ন হয় না।

বিষয়টা একটু বিশদভাবে ভাবা দরকার। শিল্পে যখন কোনো জিনিস তৈরি হয় তখন জগতের কোনো না কোনো খনিজ দ্রব্য ফুরিয়ে আসে। সেই খনিজ দ্রব্য আর নতুন করে তৈরি হয় না। শিল্প আপাতদৃষ্টিতে ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। গত ত্রিশ বছর ধরে শিল্প ঐশ্বর্য এনেছে। আরো কয়েক শতাব্দী ঐশ্বর্য আনবে হয়তো। কিন্তু যা ধ্রুব তা হচ্ছে দ্রুত জগতের খনিজ ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যত দ্রুত জগতে শিল্প বাড়বে তত দ্রুত জগতে খনিজ দ্রব্যের অভাব দেখা দেবে। শিল্পের বৃদ্ধি নির্ভর করে খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারের ওপর। যতদিন খনিজ দ্রব্য থাকবে ততদিন শিল্প থাকবে। শিল্পের বৃদ্ধির কটা সীমারেখা আছে। একদিকে শিল্প মানুষের ঐশ্বর্য বাড়ায়। আবার অন্যদিকে শিল্প খনিজ দ্রব্য নিঃশেষ করে পৃথিবীকে দেউলিয়া বানায়। শিল্প শেষ পর্যন্ত খনিজ দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ আনবে। কারণ খনিজ দ্রব্য একবার ফুরিয়ে গেলে ফের তৈরি হবে না। পৃথিবীতে ভবিষ্যত নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করছেন তাঁদের মতে খনিজ দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ আসতে বেশিদিন বাকি নেই। শিল্প ঐশ্বর্য আনে কথাটা সর্বৈব সত্য নয়। খনিজ বস্তুর দুর্ভিক্ষ এলে ঐশ্বর্য লুপ্ত হবে।

খনিজ দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ আসবে এটা কোনো কাল্পনিক ভাবনা নয়। এটা বাস্তব সত্য। শিল্প অনিবার্যভাবে শিল্পের সর্বনাশ আনবে। সুম্পিটারের এক মূল্যবান উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, ধনতন্ত্রের মৃত্যু তার সাফল্যের হাতেই হবে (Capitalism is being killed by its achievements, Capitalism, Socialism and Democracy, 1957, pp. xiv)। ধনতন্ত্র খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার শিখিয়েছে। তার ফলে পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছে। ধনতন্ত্রের এই আপাত ঐশ্বর্য স্থায়ী কোনো উন্নতি আনে না। বরং ক্রমে এই ঐশ্বর্য পৃথিবীকে দেউলিয়া হওয়ার পথে ঠেলে দেবে। এর ফলে পৃথিবীর ভবিষ্যত অন্ধকার থেকে অন্ধকারে পৌঁছে যাবে। সম্পদ তৈরি করার নামে খনিজ সম্পদের অপব্যবহার হয়। এই অপব্যবহার অধিকাংশ লোকের কাছে ধরা পড়ে না। কারণ এই অপব্যবহার শিল্পজাত দ্রব্য হিসেবে লোকের কাছে পৌঁছায়। লোকে বুঝতে পারে না পৃথিবী কত দ্রুত খনিজ দ্রব্য হারাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। সবুজ বনানী, জলজ এবং স্থলজ সম্পদ হারাচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। এইভাবে পৃথিবী উত্তরোত্তর দরিদ্র হয়ে পড়ছে। সব থেকে বড় কথা পৃথিবীতে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। বড় বড় শিল্পের ফলে পৃথিবীতে তাপাঙ্ক বেড়ে চলেছে। যার কারণে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

এর গোড়ায় রয়েছে শিল্পায়ন বা সাধারণ মানুষ যাকে বলে উন্নতি। শেষ পর্যন্ত উন্নতি মরিচীকার সৃষ্টি করতে পারে। সংযোগ প্রযুক্তি বা সাইবারনেটিক্সের-এর কথা ধরা যাক। সংযোগ প্রযুক্তি উৎপাদনকে আরও বাড়িয়ে দেবে এমন একটা ধারণা এসেছিল। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল মনে করেনসংযোগ প্রযুক্তি বিপ্লবে উৎপাদনশীলতা অতি সামান্যই বেড়ছে। (For one thing, the cybernatic, revolution quickly proved to be illusory. There were no spectacular jumps in productivity, The coming of Post Industrial Society, 1974, pp.463)। উন্নত দেশের প্রগতি বিশেষ একটা বাড়ছে না। বরং তাদের প্রগতি আপেক্ষিকভাবে কমে যাচ্ছে। জগতের উন্নতি ১৯৭১ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে পড়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে উন্নতি বেড়েছে এমন বলা হয়।

উন্নতি বলতে কি বোঝায় ? অর্থনীতির অর্থে উন্নতি মানে বেশি উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে বেশি মুনাফা। কিন্তু সঠিক অর্থে উন্নতি মানে মানুষের উন্নতি। সুমেখার এক তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে উন্নয়ন শুরু হয় না। শুরু হয় মানুষকে নিয়ে (Development does not start with goods; it starts with people :Small is Beautiful, pp. 178)। সম্প্রতি লণ্ডনের The Economist পত্রিকায় বলা হয়েছে, ধনী দেশগুলিতে গড় জাতীয় আয়ে শ্রমজীবিদের অংশের ঐতিহাসিক পতন ঘটলেও মুনাফার পরিমাণ বেড়েই চলেছে (But in the rich world's

labour's share of GDP has fallen to historic lows, while profits are soaring : January 20-26, 2007)। যতদিন পর্যন্ত অর্থনীতি উৎপাদন কেন্দ্রিক এবং মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে থাকবে ততদিন মানুষের উন্নতি হবে না। শ্রমিকদের না বেকারত্ব ঘুচবে, না দারিদ্র ঘুচবে। উৎপাদন এবং মুনাফা কেন্দ্রিক অর্থনীতি প্রযুক্তির ওপর জোর দেয় বেশি। প্রযুক্তি শ্রমকে যতটা সম্ভব অপসারিত করে। শ্রমের পরিবর্তে প্রযুক্তি ব্যবহার হয়। প্রযুক্তির বদলে শ্রমের ব্যবহার হয় না। অপ্রয়োজনের যে উৎপাদন এবং তা থেকে মুনাফা সৃষ্টির মাধ্যমে যে ঐশ্বর্য তৈরি হয় তার একটা মাদকতা আছে। সে মাদকতা পৃথিবীর মানুষের মনস্তত্ত্বকে অধিকার করে আছে। তা থেকে মুক্তির উপায় বড়ই কঠিন। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যতের জন্য মুক্তি পাওয়া দরকার। মুক্তির এক যুক্তিপূর্ণ পথ গান্ধিজির পথ। গান্ধিজির অর্থনীতিতে ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয় না। কিন্তু গরিবির অবসান ঘটে। সেই ঐশ্বর্যশূন্য, গরিবিমুক্ত সমাজে মানুষের শুধু প্রয়োজন মেটানো হয়। লাভকে এবং লোভকে সংযত করা হয়। গান্ধিজি বলেছেন - উৎপাদন এবং তার ভোগ যদি স্থানীয় হয় তবে যে কোনো মূল্যে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়ে যায় (When production and consumption both become localised, the temptation to speed up production and at any price, disappear. Harijan, Nov-2, 1938)।

ঐশ্বর্যশূন্য এবং গরিবিমুক্ত অর্থনীতি এক মূল্যবোধের অর্থনীতি। এই অর্থনীতি আয়ত্ত করার একটি উপায় আছে। সেটি হলো অর্থনীতিতে নীতি এবং মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন আনা। এই কথা জোরের সঙ্গে এরিক ফ্রোম বলেছেন তাঁর 'টু হ্যাভ টু বি' বইতে। অর্থনীতিতে মনস্তত্ত্বের কথা প্রথম বলেছেন গান্ধিজি। তিনিই প্রথম মনের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বর্তমান অর্থনীতি ভোগের লোলুপতায় মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে যতটুকু ঐশ্বর্য এসেছে সেই ঐশ্বর্য খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং লোভকে সংযত করতে হবে। জানতে হবে মানুষকে কিভাবে সুখী করা যায়। সেটাই হবে প্রকৃত অর্থনীতি। এরিক ফ্রোম এবং আরো অনেকে এই অর্থনীতির কথা বলেছেন। এই অর্থনীতি ঐশ্বর্যমুক্ত, গরিবিশূন্য অর্থনীতি, যেখানে ভোগের বিলাস নেই, আছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা আসে যদি শিল্প প্রযুক্তিকে যথাসম্ভব সংযত রাখা যায়, কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুমেখার এক মূল্যবান উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, মানব জীবন শিল্প ছাড়া চলতে পারে কিন্তু কৃষি ছাড়া বাঁচবে না (human life can continue without industry, whereas it cannot continue without agriculture, pp. 117)। শিল্পের উন্নতি খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। কৃষির উন্নতি কিন্তু স্থায়ী। মানুষের জীবন নির্ভর করে কৃষির ওপর। এখন থেকে দু'শো কিংবা তিনশো বছর পর যখন খনিজ দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাবে তখন কৃষি এবং কৃষিজ শিল্প মানুষের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হবে। ভারতের সাড়ে ছ'লক্ষ গ্রাম সেদিন কৃষি এবং কৃষিজ শিল্পের ওপর বেঁচে থাকবে। ভারতের কৃষির দুই চরিত্র - এক ধনতান্ত্রিক কৃষি, দুই, চাষিভিত্তিক কৃষি। মাইরন ভাইনার বলেছেন, ধনতান্ত্রিক কৃষি শুধুমাত্র বাজার ও মুনাফার জন্য। কিন্তু কৃষি অর্থনীতি শুধুমাত্র লাভের জন্যই নয়। (Capitalist agriculture is considered as production from market and for profit, without regard to whether wage labour is employed or how much mechanisation there is, and peasant agriculture is a form production which does not go to market for profit. The Indian Paradox, pp.110)।

ভারতে ভবিষ্যতে এবং সাড়ে ৬ লক্ষ গ্রামের ভবিষ্যত নির্ভর করে এই দুই প্রকার কৃষির ওপর। যদি কৃষি অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষিজ শিল্প তৈরি করতে পারে তা হলে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠবে। কৃষিকে অবহেলা করে যদি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয় তাহলে ধনতান্ত্রিক কৃষি চাষিভিত্তিক কৃষিকে গ্রাস করবে।

ঋণ স্বীকার : দর্পণে মুক্তমন, এপ্রিল ২০০৭

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কৃষিভাবনা

অধ্যাপক অনির্বাণ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার দিক হলো পল্লী চিন্তা ও পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা। কবির পল্লীভাবনার রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায়। কবি কল্পনা বিলাসী হতে পারেন আর কবিতা হতে পারে কল্পনালতা — কিন্তু স্বপ্নসন্ধানী না হলে সফল কর্মী হওয়া যায় না। স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন দেখানো — কবির ধর্ম সন্দেহ নেই। তবে বাস্তবে রূপ দেওয়া অবশ্যই সার্থক কর্মীসত্তার কর্ম।

ইংরেজ শাসনে এদেশের চূড়ান্ত আর্থিক বিপর্যয় ঘটেছিল। স্বার্থপর, পরদেশ লুন্ঠনকারী ইংরেজ রাজশক্তি তাঁবেদার মধ্যসত্তভোগী সামন্ত প্রভুরা, পল্লী ভারতকে শোষণ করে নিঃস্ব ও রক্তহীন করে তুলেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বিশাল শ্রেণি বৈষম্য। শহর যত বড় হয়েছে, বেড়েছে বাবু শ্রেণির আমোদের মাত্রাও। আর পল্লী ডুবেছে গভীর গভীরতর আঁধারে। গ্রামের চাষি-মজুর শ্রেণির অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। জমির সরকারি খাজনা আর চাষের জন্য মহাজনের কাছে ঋণ কৃষক সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই দুর্গতি থেকে কৃষক সমাজকে রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নানারকম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। যেমন — সমবায় প্রথা প্রচলন, কৃষকদের বিনা সুদে ঋণদান, কৃষি সহায়ক ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি। শিলাইদহে জমিদারি তত্ত্বাবধানের সময় থেকে পল্লীবাংলা উন্নতির জন্য কবি কিছু কাজ করেছিলেন কৃষকদের কথা ভেবেই। পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজের সমস্ত অর্থ কৃষিব্যাঙ্কে দান করেছিলেন।

প্রসঙ্গত মনস্বী অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বসুর পরীক্ষাও অনুরূপ। তিনি লিখেছেন — 'বিশ শতকে প্রথম দুই দশক ধরে পূর্ববঙ্গীয় জমিদারির সঙ্গে কবির নিয়মিত যোগ ছিল এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কৃষি-সংস্কার ও পল্লী সংগঠনের কাজে প্রলিপ্ত ছিলেন। নোবেল পুরস্কারের টাকাও তিনি এই অঞ্চলের কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় কৃষিব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমবায় আন্দোলন, ধর্মগোলা স্থাপন, কৃষি খামারের পরিকল্পনা, চাষবাসে বিজ্ঞানসম্মত প্রথার প্রয়োগ, আমেরিকা থেকে শিখিয়ে পুত্র, বন্ধু পুত্র ও জামাতাকে গ্রামোন্নয়নে নিয়োজিত করা — এসব বৈপ্লবিক কর্মধারা, চিন্তা ও ক্রিয়াসিদ্ধ তো তাঁর প্রৌঢ় বয়সেই অভিজ্ঞতা।'

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অদূরে শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠনের কাজে লাগিয়েছিলেন বন্ধু কালীমোহন ঘোষকে। এমনকি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। কবির পল্লীচিন্তার মূলে রয়েছে কবির এই কর্মীসত্তা। এর নিরন্তর তাগিদেই কবি পল্লীবাংলা ও পল্লীভারতের অসহায়তা ও অনৈক্যের মূল সূত্রটি ধরতে পেরেছেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একদা সাহিত্য সহায়ক সুলেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন—সম্পন্ন জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও জীবনের সূচনাপর্বে একদিন জমিদারি তদারককারীরূপে শিলাইদহ ও শাহাজাদপুরে বাসা বেঁধে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসী কৃষক কারিগর ও দুঃস্থ সাধারণ

মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নিছক কৌতুহল করুণা নিয়ে যে তাঁদের জীবনধারা লক্ষ্য করেননি তিনি, তার পরিচয় তাঁর ছিন্নপত্রে এবং অনেক ছোটগল্পে। ... প্রসঙ্গক্রমে কৃষকদের সংকট সমস্যার কথাও বলেছিলেন তিনি — যার সামান্য সংক্ষিপ্তসার টোকা আছে আমার তখনকার ডায়েরিতে। ... যাঁরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজ সৌধের উঁচুতলায় জন্মেছিলেন বলে নিচুসোপানের মানুষকে তিনি ভালো করে দেখার বা চেনার সুযোগই পাননি, এই কথাগুলি তাঁদের নিরসন করবে। গ্রামের মানুষকে তিনি যথেষ্টই চিনতেন। আর তা চিনতেন বলেই ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কতকটা তাঁরই ধারার পল্লী সমবায় গঠন করে নিঃসম্বল কৃষককে রক্ষা করার কথা চিন্তা করেছিলেন। উন্নত সেচ ও সারের এবং পল্লীবাসীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধানের নতুনতর ব্যবস্থার জন্য তিনি যথেষ্ট মাথাও ঘামিয়েছিলেন তাঁর স্বল্প সময়ের জমিদার জীবনে। শুধু তাই নয়, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষ মজুমদারকে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিবিদ্যা শেখানোর জন্য আমেরিকা পাঠানোর মূলে ছিল তাঁর কৃষি ও কৃষকের সমুন্নতি সাধনের ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ।

কৃষক সমাজের অসহায়তা দূর করতে রবীন্দ্রকল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে সমবায়নীতি ও বীজ ভাণ্ডার স্থাপনের আদর্শ। কবি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন — 'দেশের বারো আনা লোক চাষি, তারা আরো ভালো চাষ করবে একথা না বলে তারা ষড়যন্ত্রের মতো চরকা চালাবে এ উপদেশ মানুষের অবমাননা। সমবায় প্রণালীতে কৃষির উন্নতির চেষ্টা যদি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করা হয়, ততটুকু পরিমাণেই সফলতা স্থায়ী হবে এবং ক্রমশই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেননা এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সঙ্গত। 'রাশিয়ার চিঠি'-র বিভিন্ন পত্রে এই বিষয়টিও ঘুরে ফিরে এসেছে। সেদেশের কৃষি ব্যবস্থা ও চাষিদের জীবনযাত্রার বিবরণে পল্লী সংগঠনেরও আভাস পাওয়া যায়। প্রশান্ত কুমার, নির্মল কুমারী মহলানবীশকে লেখা ৪টি পত্র 'রাশিয়ার চিঠি'-তে সংকলিত হয়েছে। এগুলিতে নানান বিষয়ের আলোচনার মধ্যে রাশিয়ার কৃষিজীবী শ্রেণির বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নির্মলকুমারীকে কবি লিখেছেন — 'এখানে এসে সবচেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষা সকলকেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি আনন্দিত হয়েছি' (দ্বিতীয় পত্র)।

কৃষিপ্রধান দেশ ছিল জার আমালের রাশিয়া। বিপ্লবের পর সেই পুরনো ধরনের কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। চাষি সম্পর্কিত অবজ্ঞাসূচক ধারণাগুলিকেই জনসাধারণের মন থেকে লোপ পাইয়ে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলছে। কৃষি বিদ্যাচর্চার উন্নতি, কৃষি শিক্ষালয় স্থাপন, বীজ ভাণ্ডার নির্মাণ প্রভৃতিকে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় যে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সে কথা স্বীকার করে কবি পরাধীন ভারতের দুর্বলতার দিকটিও অকপটে তুলে ধরেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তকুমারকে লিখেছেন — 'রাশিয়ার সমস্ত দেশ - প্রদেশকে জাতি উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড় সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত যে করে তোলা সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি না মনে করতে পারিনি' (পঞ্চম পত্র)।

আবার এই পত্রটিতে রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রণালীর মধ্যেকার যান্ত্রিকতাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে লিখেছেন — 'সত্যের জোরকে গায়ের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি, একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে'।

প্রশান্ত কুমারকে লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'-র তৃতীয় পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আত্মশক্তির জাগরণ ও প্রচেষ্টা, কৃষি শিল্প ও সংস্কৃতি নবায়ণ, বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বাণীপ্রচার প্রভৃতি কবিকে বিস্মিত করেছে। তাই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি এই — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত' (তৃতীয়পত্র)।

ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বহু দেবস্থান ও তীর্থস্থান রয়েছে। ভারতের পূর্বে পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ — সর্বত্রই দেবস্থানের ছড়াছড়ি। ধর্ম পিপাসু মানুষজন সেইসব দর্শন করে পুর্ণ অর্জনে

প্রয়াসী হয়। তবু ভারতীয় কবির কাছে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া 'তীর্থস্থান' হয়ে উঠেছে। কারণ সেখানে কবি দেখেছেন যথার্থ মানুষের অধিকার ও মর্যাদা স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার ভূমিকাকে তাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম তীর্থদর্শন বলে কবির মনে হয়েছে। অবশ্য একটু সংশয়ও তাঁর মনে উদয় হয়েছে। কবি লিখেছেন — 'এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিকে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটি বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে' (তৃতীয় পত্র)।

নির্মলকুমারীকে লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'র চতুর্থপত্রটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে, এখানে রাশিয়ার কৃষিজীবি ও কৃষিব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে কবির বারেবারেই তাঁর স্বদেশের কথা মনে পড়েছে। রাশিয়ার চোখ ধাঁধানো উন্নতির পাশে ভারতের হতদরিদ্র ছবি কবি মনকে পীড়িত করেছে, পরাধীন দেশে কৃষক সমাজের দুঃখ তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন — 'এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ জোড়া চাষিদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষিদের সঙ্গে প্রত্যহ দেখাশোনা — ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মত নিঃসহায় জীব অল্পই আছে। ওরা সমাজের যে তলায় সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছায়, প্রাণের হাওয়া বয়না বললেই হয়' (চতুর্থ পত্র)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহের জমিদারি-জীবনে গরীব চাষি প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবছেন — সে সময় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তায় কৃষক সমাজের ভাবনা ঠাঁই পায়নি বলে কবি আক্ষেপও করেছেন।

মল্লিক লিখেছেন — 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর পুরস্কারের এক লক্ষ আশি হাজার টাকা কৃষিব্যাঙ্কে জমা রাখার ফলে ব্যাঙ্কের কর্মতৎপরতা আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কৃষিব্যাঙ্ক স্বভাবতই দুঃস্থ প্রজাদের প্রভূত উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কৃষিব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের আসল টাকাটাও আর আদায় করা যায়নি।'

হতাশ কবি তাই পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের পাশে গড়ে তুলতে চেয়েছেন কৃষিখামার। এই ভাবনারই রূপায়ণ ঘটেছে শ্রীনিকেতন স্থাপনের মাধ্যমে। জমিদারি জীবনে কবির অভিজ্ঞতা এই রকম যে, বাংলার কৃষিযোগ্য জমিগুলি খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত। এ কারণে চাষে আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার বাধা পায় এবং কৃষির উন্নতি ব্যহত হয়। তাই কবির অভিমত হলো — 'এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে — জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষির; দ্বিতীয়ত সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা' (চতুর্থ পত্র)।

কৃষির উন্নতিতে এই সমবায় প্রণালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই আশাবাদী। 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার অংশেও এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন — 'আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায় - প্রণালীর দ্বারা গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীন শক্তিকে নিমার্জ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস'।

কবির গ্রাম-চিন্তায় গ্রাম্যতা নেই। তাঁর মতে, গ্রাম্যতা হচ্ছে এক ধরনের সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষার ফল। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাসে একালের গ্রাম হবে মানসিকতার দিক দিয়ে যুগোপযোগী। তুচ্ছ সংকীর্ণতার উর্দ্ধে গ্রাম হবে প্রাণস্ফূর্তিতে ভরপুর। সেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে নির্বাধ'। কবি লিখেছেন, — 'শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এক দীনতা, যে গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখান থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখছি — গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয়, তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ

হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।'

পল্লীবাংলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা আরো বেশি সংহত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপরেখা দেখে। 'রাশিয়ার চিঠি'র পরিপূরক হিসাবে উপসংহার ও পরিশিষ্টে সংকলিত 'গ্রামবাসীদের প্রতি' ও 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধ দুটিতে কবির পল্লীভাবনা ও চাষিদের জীবনযাপন নিয়েও অনেক কথা আছে। কবির মতে গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ, সেই সত্যকে আশ্রয় করেই ঘটেছিল দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পল্লীবাংলার প্রতি কবির আহ্বান এই — 'পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তোমাদের দৈন্য-দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকান্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তি সম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণে সেই শক্তি সমবায়ের সাধনা।'

বাংলার গৌরব একদা পল্লীবাংলার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। কবি সেকথা স্মরণ করে লিখেছেন, — 'একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল দেশের যোগবন্ধন। আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা প্রবাহ পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। পরাধীন ভারতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা সর্বশ্রেণির মধ্যে প্রসারিত না হওয়াতে বিশেষ করে গ্রামবাংলার কৃষিজীবী সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও আধুনিক সভ্যতা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্নহয়ে পড়েছে। অন্য দিকে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শহরের পাশে গ্রামের জীবনকেও সমানভাবে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার ফলে গ্রাম-শহরের বিভেদ ঘুচে গেছে। সার্বিক উন্নতির ফসল ফলেছে সেদেশে।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন স্বদেশবাসী ও স্বদেশভূমির উন্নতির কথা ভেবেছেন। দেশের ম্লান-মূক-মূঢ় মানুষের মুখে ভাষা, বুকে আশা জাগাতে চেয়েছেন। শরীর ধারণের জন্য অন্ন সংস্থানের কথাও বলেছেন। তাঁর ভাবনায় পল্লীবাংলার প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রত্যয়সিদ্ধ অভিমত এই — 'পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে'।

যান্ত্রিকতা নয়, সপ্রাণ ও সজীব আবেগে পল্লীবাংলার অন্তরকে কবি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন বলেই পল্লীভাবনা তাঁর স্বদেশ-ভাবনারই নামান্তর হয়ে উঠেছে।

ঋণ স্বীকার : পল্লীবন্ধু, মার্চ ২০০৭

সিডি তালিকা

- তরল সার (বাংলা ও ইংরেজি) ২৫০/-
- বিকাশ (বাংলা ও ইংরেজি) ২৫০/-
- উন্নয়নের সাক্ষী ১৫০/-
- পীরগঞ্জের গল্প ৩০০/-
- লোকায়ত ৩০০/-
- খাবার নিয়ে ভাবার আছে ২০০/-
- ট্রাভেলার্স টু দ্য ল্যান্ড অফ হোপ ২০০/-
- লোন ফাইটার ১০০/-
- মিক্সড ক্রপিং ১০০/-
- ভার্মি কম্পোস্ট ১৫০/-
- পালমিরা পাম ১৫০/-
- ন্যাচারাল ডাই ১৫০/-
- অন্নপূর্ণা ৩০০/-
- চাষ না মৃত্যু ১৫০/-
- আলবাঁধা ১৫০/-
- হাঁসপাহাড়ি ১৫০/-
- শিশু শ্রমিক ১৫০/-
- হার্বস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ২৫০/-
- হার্বাল মেডিসিন ৩০০/-
- রসুই বাগান (বাংলা ও ইংরেজি) ৩০০/-
- The old man and his jungle (ইংরেজি) 350/-

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার
৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৪২, ফোন : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিণতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

বিপ্লব ভট্টাচার্য্য

জমি এবং উৎপাদনশীলতা

কৃষি হল জমি (মাটি) কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই ক্ষেত্রটিতে বস্তুকে পরিমাণ ও সংখ্যাগতভাবে বাড়ানো হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম বা জৈব প্রক্রিয়ায় মাটি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও জৈব উপাদান (যথা ব্যাকটেরিয়া, কেঁচোর ন্যায় অনুজীব) গ্রহণ করে এবং উর্বর হয়। ফসল চাষের পর জমি যে পুষ্টি হারায় (উৎপাদনশীলতা), তা পূরণের জন্য জমিতে পশু-পাখির বর্জ্য (মল, বীট) ও লতা-পাতা পচিয়ে তৈরি করা জৈব সার প্রয়োগ করা হত। একই জমিতে একই ফসল চাষের ফলে যখন উৎপাদনের হার কমে যেত তখন চক্রাকার ফসলে, যথা-মটর, অড়হর, কলাই বা অন্যান্য ডাল চাষ করা হত এবং জমির হ্রাস পাওয়া উৎপাদনশীলতা বা পুষ্টি এভাবে ফিরে আসত। আর এভাবেই কৃষক জনতার অভাবেই হাজারো বছরের নিরবিচ্ছিন্ন শ্রমের ফলে জমির ওপরের উর্বর মাটি তৈরি হয়েছে।

বীজ বৈচিত্র

ভারতীয় কৃষক তথা কৃষি-বিজ্ঞানীরা একই প্রজাতির বীজের বৈচিত্রময় বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। যেমন, একমাত্র ধানেরই, পাঁচ হাজার ধরনেরই বেশি বীজের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। এ সমস্ত বীজের মধ্যে এমন সব 'জিন' ছিল যার ফলে পোকা-মাকড়ের কামড় থেকে বেঁচে যেতো বা প্রবল খরায় টিকে থাকত। বানভাসি জলের ওপর মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারতো। এমন কি অতিকাদা জমিতে এমন বিশেষ এক ধরনের ধানের চাষ করা হতো যার ফলে ওই জমি স্বাভাবিক জমিতে পরিণত হতে পারত। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের তুলাই পাঁজি, কাশ্মীরের বাসমতি, এই অঞ্চলের থাসা, বাদশাভোগ ও জুমের এক ধরনের চিকন ধান থেকে সুগন্ধিযুক্ত চাল তৈরি হয়। এর কারণ হল, বহু প্রজন্মের কৃষকের ঝাড়াই-বাছাই, গুণাগুণ বিচার করে নির্বাচিত প্রকারগুলির প্রজন্মের কারণে তাতে এমন সব 'জিন' একত্রিত হয়েছে যার ফলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে এ সমস্ত ধানের চাষ হতো।

কীটনাশক পদ্ধতি

বাস্তুতন্ত্রের বা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে ভারতীয় কৃষক-বিজ্ঞানীরা ফসলের শত্রুপোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'জৈব নিয়ন্ত্রণ' পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন, জুমে একই সাথে একাধিক ফসলের চাষ করা। সমতল জমির এক কোণে বা মাঝামাঝি জায়গায় গর্ত তৈরি করে (আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে খাঞ্জা) লাটি, উপল, শিং, মাগুর, কই প্রভৃতি মাছের চাষ করা হতো এবং এ সমস্ত মাছ চারা গাছের পোকামাকড় খেয়ে (প্রাকৃতিক) খাদ্য-শৃংখলের নিয়ম অনুযায়ী ফসল রক্ষা করতো। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে জমিতে হিজল বা অন্যান্য গাছের ডাল পুঁতে পাখিদের বসার ব্যবস্থা করা হতো এবং এ সমস্ত পাখি পোকামাকড় খেয়েও ফসল রক্ষা করতো। তাছাড়া, গরু-মহিষের মূত্র, নিম, জাম, হলুদ, আদা, রসুন, ছাই প্রভৃতি কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

সেচ ব্যবস্থা

ভূর্গভের জলতলের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য মাঠের মধ্যে জলাশয় সৃষ্টি, অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখা, নদী থেকে খালকেটে সেচের ব্যবস্থা করা হতো।

বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি

পরিষ্কার খড়ের বেণী তৈরি করে বীজ সংরক্ষণ করা হতো। এই বেণীতে বীজ সংরক্ষণ সময় থেকে খোলার সময় পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটত না। ফলে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বীজ নষ্ট করার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা।

ভারতের চিরাচরিত কৃষি বিজ্ঞানের কোনো লিখিত দলিল নেই। বংশ পরম্পরাগত জ্ঞানের দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত প্রযুক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকরা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে কৃষি ব্যবস্থা সামগ্রিক বিচারে পুঁজি কেন্দ্রিক ছিল না। কিন্তু কৃষকরা বর্ণ-সামন্তবাদী শোষণের শিকার ছিল।

আধুনিক চাষাবাদ বা শিল্পাশ্রয়ী কৃষি ব্যবস্থা

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'সবুজ বিপ্লব' নামের বহুল প্রচারিত আধুনিক চাষাবাদ ভারতে চালু হয়। এই ব্যবস্থায় কৃষিকাজ প্রধানত শিল্পে তৈরি উচ্চ ফলনশীল বীজ, কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, রাসায়নিক ওষুধ এবং পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট, ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার ঝাড়াই মাড়াইয়ের মেশিন, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি উপকরণ নির্ভর। এর মধ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ হল বিশ্বযুদ্ধে আবিষ্কৃত মারণাস্ত্র তৈরির পরোক্ষ ফল। এ সমস্ত উপকরণ কিনতে নগদ অর্থ বা লগ্নী পুঁজির প্রয়োজন। ভারত সরকার, মার্কিন বহুজাতিক তৈরি এ সমস্ত উপকরণের বাজার তৈরির জন্য ভরতুকি দামে কৃষকদের কেনার ব্যবস্থা করে। ফলে কৃষকদের শ্রমে সৃষ্ট উৎপাদনের উদ্বৃত্তের বড় অংশটি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে চলে যাবার প্রক্রিয়া তৈরি হয়। নগদ অর্থের অভাবে গরিব ও মাঝারি কৃষকরা নিঃস্ব হতে থাকে এবং দিনমজুরে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে কাজের সন্ধানে ও সমস্ত ভূমিহীন দিনমজুরদের শহরে ভিড় করার বার্ষিক গড় দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ। মাঝারি কৃষকদের একটি অংশ ধনী কৃষকদের পরিণত হয়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী জমিদার শ্রেণি গড়ে ওঠে।

জমিতে প্রতিক্রিয়া

বাছবিচারহীনভাবে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কেঁচোর মত অণুজীব, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির গঠন প্রক্রিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাবার ফলে মাটি ঘনবিন্যস্ত বা দলাদলা হয়ে পড়ায় জমির পুষ্টিহীনতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশের ৭০ শতাংশ কৃষিজমি বছরে হেক্টর প্রতি ৫০ কিলোগ্রাম করে পুষ্টি হারাচ্ছে। নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাসের মত প্রধান পুষ্টি উপকরণগুলোর ক্ষয়ের পরিমাণ বছরে দাঁড়িয়েছে ৫.৮ মেট্রিক টন। ২০টি রাজ্য আড়াই লক্ষ মাটির নমুনা পরীক্ষা করে ৪৭ শতাংশ জমির মধ্যে দস্তার ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

উৎপাদনের হার হ্রাস

ক) ৮০ দশকে হেক্টর প্রতি খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৪৭ শতাংশ। নব্বই এর দশকে এই হার কমে দাঁড়ায় ০.৯২ শতাংশ।

খ) ৮০ দশকে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.১০ শতাংশ। ৯০ এর দশকে এই হার কমে দাঁড়ায় ২.২১ শতাংশ।

গ) কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ভারতের ১ কোটি ১৬ লক্ষ হেক্টর জমি নষ্ট হয়ে গেছে।

বীজের বাজার

ভারতে বার্ষিক চাহিদা হল ৭০ লক্ষ টন। মোট চাহিদার তিন ভাগের দুইভাগ বীজ ছিল কৃষকের নিজস্ব। তিন ভাগের দুইভাগ বীজের জোগান (অবশ্যই উচ্চ ফলনশীল) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বীজ কর্পোরেশনের হাতে চলে যায়। এভাবেই বীজের ওপর কৃষকের অধিকার হাতছাড়া হয়ে বাজার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবার প্রক্রিয়া চালু হয় এবং বীজ-বৈচিত্র লুপ্ত হতে থাকে।

১৯৯১ সাল থেকে পরবর্তী পর্যায়

বিশ্বায়নের নামে ১৯৯১ সাল থেকে ভারতে নয়া -অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করা হয়। এই সংস্কার চালু হবার আগে পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বা কৃষি পণ্য আমদানির উপর

নিষেধাজ্ঞা ছিল। অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হবার পর থেকে এ সমস্ত বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৭১৪ টি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ তালিকায় ছিল। ২০০০ সালের মধ্যে ২০০০টি পণ্যের আমদানির ওপর থেকে বাধা-নিষেধ তুলে দেওয়ায় বিদেশি চাল, গম ও অন্যান্য দানাশস্য, সবজি, মশলা, ৬০ ধরনের সামুদ্রিক মাছ, চা, দুধ ও দুধজাত দ্রব্য, পশুপাখির মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের মদ, বিয়ার, পশম ও সুতো জাতীয় দ্রব্য ভারতের বাজারের দখল নিচ্ছে। ফলে দেশিয়ভাবে ও সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন থেকে কৃষকদের সরে আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের কৃষকরা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছ আমদানির ওপর বাধানিষেধ তুলে দেওয়ায় তপশীলি জাতিভুক্ত ১ লক্ষ মহিলা শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। তাঁতশিল্পের বিশাল ক্ষেত্র থেকে কারিগর ও শ্রমিকরা সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নীতি চালু করায় খাদ্যশস্য তথা দানাশস্যের উৎপাদন থেকে সরে এসে অর্থকরি ফসলের উৎপাদনের জন্য কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে। ২০০০ সালের মধ্যে ৩৭,৬৭০০০ হেক্টর জমি দানাশস্যের উৎপাদন থেকে সরে এসে অর্থকরি ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হচ্ছে। যথা ১৯৯৭-৯৮ অর্থবর্ষে দানাশস্য (খাদ্যশস্য) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল ১৯৫০ লাখ টন। উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ১০০০ লাখ টন ফলে ঘাটতি থেকে গেছে ৯৫০ লাখ টন।

২০০৬ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে গম, ডাল ও চিনি বিনা আমদানি শুল্কে আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এর বরাত দেওয়া হয়েছে বেসরকারি কোম্পানিকে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, পঞ্চাশের দশকে খাদ্য-স্বয়ম্ভরতার যে নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল তা পরিত্যাগ করেছে এবং জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার জাল গুটিয়ে ফেলে বেনিয়া জাতিগোষ্ঠী ও তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই খাদ্যনীতি যার অনিবার্য পরিণতি দুর্ভিক্ষ এবং এর শিকার হবে ভারতের জনজাতি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তপশীলি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মানুষ।

জমির উর্ধ্বসীমা আইন

কৃষিজমি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন তুলে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি শিল্পের নামে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানায় কৃষিজমি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকার একটি আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে যার নাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যাকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে সেজ বলা হচ্ছে।

এই অঞ্চলে ভারত সরকারের শ্রম আইন, পুলিশী আইন ব্যবস্থা কার্যকরী হবেনা এবং প্রথম ৫ বছরের কোনো কর ধার্য করা চলবেনা। এককথায় সেজ হলো একটি স্বাধীন দেশের মধ্যে একটি উপনিবেশ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ন প্রভৃতির মুন্ডুপাত না করে বামফ্রন্ট নেতারা বিশেষত সিপিএম নেতারা জল স্পর্শ করেননা। এহেন বামপন্থীরা অন্যরাজ্যে সেজের বিরোধিতা করলেও এরাজ্যের বামপন্থী সরকার কৃষকদের বিরোধিতার উপেক্ষা করে পুলিশ প্রশাসন ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জমি দখল নিলেও কোনো প্রতিবাদের ধ্বনি তাদের মুখে শোনা যাচ্ছে না। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে ১৮৯৪ সালে তৈরি বস্তা পচা জমি অধিগ্রহণ আইন প্রয়োগ করতে পিছুপা হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার শিল্পের নামে বল প্রয়োগ করে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর প্রভৃতির অঞ্চলে 'বহু ফসলী জমি' সালিম গোষ্ঠী, টাটা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিচ্ছে। এ সমস্ত ঘটনায় নবাব সিরাজদৌল্লার সময়কালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে লিজ দেওয়া তিনটি গ্রাম তার পরবর্তী পরিণতির ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ত্রিপুরায়ও বামফ্রন্ট সরকার জমি জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করে জুমিয়া কৃষকদের পাহাড়-গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে, উন্নয়নের ভেক ধরে, জাতীয় সড়কের পাশে 'গুচ্ছ গ্রামের' আড়ালে কার্যত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করছে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গুড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে ফেলায় ষড়যন্ত্র আঁটছে। একইভাবে রাজ্য সরকারের চোখের সামনে সরাসরি আইন পদদলিত করে সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকদের জমি জবরদখল করে সীমান্তে কাঁটাতরের বেড়া দেওয়া হয়েছে।

একইভাবেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো কৃষক জনতার সামনে এক বিভীষিকাময় সন্ত্রাসবাদী চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বার্ষিক ৭০ লক্ষ টনের বিশাল বীজের বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি দখল করে নিয়েছে এবং তিন ভাগের দু'ভাগ বীজ জোগানের বাজার কৃষকদের হাত থেকে চলে গিয়েছে। টারমিনেটের জিন প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি বীজের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশিষ্ট দেশিয় বীজ ধ্বংস করে এককভাবে বীজের বাজার জবরদখলের ষড়যন্ত্র করছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে কৃষি থেকে সমস্ত ধরনের ভরতুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কৃষকরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যূনতম সুযোগসুবিধা আশা করতে পারছেন না। অথচ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশে ভরতুকি চালু রয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে কৃষিকাজ অলাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। কৃষকরা বেশি বেশি সংখ্যায় সরকার ও মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। উদাহরণ হিসেবে সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান ও সবচেয়ে সংগঠিত পাঞ্জাবের কৃষকদের ঋণের কথা উল্লেখ করা যায়। ২০০৬ সালে পাঞ্জাবের কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার কোটি টাকায়। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ১২ হাজার কোটি টাকার ঋণ কৃষকরা নিয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাজন, বেনিয়া জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে। অর্থাৎ পাঞ্জাবের কৃষি অর্থনীতির বিকাশ স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ গরিব, মাঝারি, ও ধনী কৃষকদের একটি অংশের জমি মহাজন ও বেনিয়া গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এমন কি কেরালাও এর ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরাতে বাম-তকমা পরা একদল আমলাতান্ত্রিক উঠতি ধনবান বদ্‌বাবু শ্রেণী সস্তায় জমি কিনে ইটভাটা, রাবার বাগান গড়ে তুলে ত্রিপুরার পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছে।

ভারতীয় বর্ণ-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষক মানেই কতকগুলি সামাজিক বর্ণ বা পরিচিতি। তারা হলেন জনজাতি, তপশীলি জাতি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষিক সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী। এরাই সুস্থ পরিবেশ ও সুস্থ বাস্তুতন্ত্র বজায় রেখে সুস্থায়ী কৃষি ও তার সহায়ক শিল্পের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন যা হাজার হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল। আর শুধুমাত্র মুনাফার লোভে বাছবিচারহীন আধুনিক শিল্প ও কৃষি মাত্র ৫-৬ দশকের মধ্যেই পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে জীব জগতকে বিপন্ন করে তুলেছে। উৎপাদনের লক্ষ্যই হল বেঁচে থাকা। আমাদের শরীরে বিষ সহ্য করার ক্ষমতা ২.৫ পিপিএম (পার্টস বার মিলিয়ন) মাত্রা। কিন্তু 'অতি' উৎপাদনের লোভে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বেপরোয়া ব্যবহারের ফলে আমরা প্রতিনিয়ত ওই মাত্রার তিনগুণেরও বেশি পরিমাণে বিষ গ্রহণ করছি। যার ফলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন মারণ রোগ। পৃথিবীর উত্তাপ এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে, জৈব অজৈব জগত নিয়ে পৃথিবী নামক উপগ্রহের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

ঋণ স্বীকার : বিকল্প, মার্চ ২০০৭

আড্ডা pro ngo
Awareness Development Dialogue for Action
A platform of resource organisations and NGOs

রিসোর্স সংগঠনগুলির একটি বিধিমুক্ত জোট। এর পুরো নাম অ্যাওয়ারনেস, ডেভেলপমেন্ট ডায়লগ ফর অ্যাকশন — এ প্ল্যাটফর্ম অব রিসোর্স অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড এনজিওস। বর্তমানে বিভিন্ন রিসোর্স সংগঠন, এনজিও, নেটওয়ার্ক আড্ডার সাথে যুক্ত।

যোগাযোগ - আড্ডা pro ngo

C/o **D R C S C**
58A, Dharmotala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata 700 042.
Ph: 2441 1646, 2442 7311, 9433511134, Email: addango2005@yahoo.co.in

জৈব কৃষি ও মাটির জৈবিক সত্তা

অনুপম পাল

কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলিয়া, নদীয়া কয়েকদিন আগে ফুলিয়া কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জৈব কৃষি খামার দেখে এই প্রজন্মের জনৈক কৃষকের প্রশ্ন ছিল, 'বাবু জৈব সার দিয়েও বেশি ফলন পাওয়া যায় ? কম ফলন হলে দেশের লোক খেতে পাবে কী করে ? অত পরিমাণ জৈব সার পাব কোথায় ? আপনাদের মত আমরা পারব কি ?' ইত্যাদি।

জৈব কৃষি ও স্থায়ী উন্নয়ন ওই কৃষকের ধারণার মত সরলীকৃত বিষয় নয়। সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের নিরিখে ওই সংশয় নেহাতই অমূলক [১,২,৩,৪,৫, ৬,৭,৮ ক খ]। কালমার্কস অবশ্য বহু পূর্বেই শিল্পাশ্রয়ী কৃষির ভয়াবহতা উল্লেখ করেছেন [৮খ]।

১৯৬৫ সালের আগে কৃষকরা রাসায়নিক সার, বিষ এবং উচ্চফলনশীল জাতের বীজ প্রথমদিকে ব্যবহার করতে চাননি। ধীরে ধীরে সার ও বিষ খুব সহজলভ্য হয়েছে এবং এর ওপর কৃষকের নির্ভরশীলতা বেড়ে ছে। এদিকে কৃষকরা বুঝতে পারছেন যে বেশি রাসায়নিক সার ও পোকা মারা বিষ প্রয়োগ করেও আগের মত ফলন পাচ্ছেন না। নদীয়া জেলার রাণাঘাট ১ নং ব্লকের অন্তর্গত হবিবপুর অঞ্চলে জনৈক চাষি বিঘে প্রতি ৪-৫ কেজি কার্বোফুরানের মত মারাত্মক বিষ, কলা বাগানে ব্যবহার করছেন। আগে ২ কেজি ব্যবহার করতেন (ইউরোপে এই বিষ নিষিদ্ধ)। বেশি বিষ প্রয়োগেও পোকা মরছে না, উপকারি পোকা মারা পড়ছে- নিত্যনতুন বিষে বেশি দামে বাজারে আসছে। চাষ ব্যয়বহুল হচ্ছে। বাজারে প্রচুর একই ধরনের ফসল চলে আসার ফলে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। পরিবেশ দূষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

মানুষের রোগ ব্যাধিও বাড়ছে[১,২,৩]। কৃষকরা দ্বিধাগ্রস্ত।

একজন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে স্বল্প কথায় বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করছি। যদিও এই বিষয়ে আমার এই লেখার থেকে ভাল লেখা অনেক আছে এবং ভবিষ্যতে আরো লেখা হবে নিশ্চয়ই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য যোগানের বাঁধা

আসলে আমাদের মনে এখনও বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে জনসংখ্যা 'লাফিয়ে' বাড়ে এবং খাদ্য উৎপাদন ঢিমে তালে হয়। ম্যালথাসের খাদ্য জোগান ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই সরল সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু অর্থনীতিবিদ দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কার্ল মার্কসও ওই সরলতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না[১০]। ওই তত্ত্বের সাপেক্ষে প্রমাণ পাওয়া খুব কঠিন। ভারতে স্বাধীনতার সময় জনসংখ্যা ছিল কম বেশি ৪০ কোটি এবং খাদ্য উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০০ লাখ টন। ২০০১ সালে জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি এবং খাদ্য উৎপাদন প্রায় ২০২০ লাখ টন। অর্থাৎ জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে এবং খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ। শুধু তাই নয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য গুদামে রয়েছে - প্রায় ৬ কোটি টন। সব মানুষ দুবেলা পেট পুরে খাচ্ছেন তাও বলা যাবে না। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে একটি বিরাট সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের সহজলভ্যতা

ইংরেজ রাজত্বেই দেশে দুর্ভিক্ষের জুজু চালু হল। ফলন কম তাই দুর্ভিক্ষ। এই তত্ত্ব সহজে যেমন মেনে নেওয়া হয়েছিল তেমনি এই জুজুকে ইংরেজরা চালু রেখেছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক অর্মত্য সেন দেখিয়েছেন — দুর্ভিক্ষের মূল কারণ খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি নয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যের বন্টন ব্যবস্থা ও কিনে খাওয়ার ক্ষমতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ[৪]। ১৯৪৩ সালে চালের মন ৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪০ টাকা হয়েছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০-৮০ টাকা মন হয়েছিল। ১৯৪১ সালের আমন ধানের উৎপাদন ১৯৪২'র থেকে কম হয়েছিল। তাহলে ১৯৪২ সালে দুর্ভিক্ষ হল না কেন[৪]? বছর সাতেক আগে বাজারে পেঁয়াজের ব্যাপারটাই দেখুন না। বাজারে পেঁয়াজ থাকলেও দাম ছিল ৬০-৭০ টাকা কেজি। বড় কোনো বিপর্যয় না হলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ নেই বলছেন অধ্যাপক সেন[৩]।

সবুজ বিপ্লব উত্তর অবক্ষয়

'ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য' অল্প সময়ে বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভরতুকিযুক্ত সার, কৃষি বিষ, বীজ ও সেচ সহ 'সবুজ বিপ্লব' চালু হওয়ার ৪০ বছর পরে 'অধিক উৎপাদন' হলেও সবাই পেটপুরে খেতে পাচ্ছেন — এটা বলা যাবে না, মাথাপিছু খাদ্যের জোগান কমেছে[১৬]। ধান ও গমের ফলন ইদানিং কমতে শুরু করেছে, বেশি রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনেক পোকার প্রজাতির প্রতিরোধশক্তি, পুনরুত্থান শক্তি জন্মেছে। পোকা সহজে মরছে না। মাটির তলার জল শুকিয়ে যাচ্ছে, বেড়েছে আর্সেনিক দূষণ, নাইট্রেট দূষণ। যার ফলে মানুষ মারণ ব্যাধির শিকার হচ্ছেন[১,২]। মৃত্তিকা ক্ষয় ও অনুর্বর জমির পরিমাণ বেড়েছে। কৃষি বিষের দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। মানুষের দেহে, খাদ্যে, মাতৃদুগ্ধে, গোদুগ্ধে, জলে, বন্য জন্তু, সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ছে ক্যানসারের মত ব্যাধি। সর্বোপরি দেশের বিপুল জৈব বৈচিত্র ধ্বংসের জন্য ভবিষ্যত খাদ্য সুরক্ষার পথ অনিশ্চিত হচ্ছে[১,২,৫]। কৃষকেরা অধিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। প্রশ্ন থেকে যায় উৎপাদন বাড়ালেই কী খাদ্য সমস্যা মিটবে?

ক্রমাগত রাসায়নিক সার সহ এক ধরনের ফসল (যেমন ধানের পর ধান) চাষের ফলে দেশের ৪২ হাজার অমূল্য ও বৈচিত্রপূর্ণ ধানের মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট আছে। হারিয়ে গিয়েছে নানা জাতের আম, নটে, কচু, গম, মাছ ও কীটপতঙ্গ। শুধু তাই নয় হাজার হাজার বছর ধরে চালু বিভিন্ন দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দেশজ বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানও হারিয়ে গিয়েছে — যেমন দেশজ পদ্ধতিতে কীট রোগ নিয়ন্ত্রণ, ঢেকিতে ধান ভাঙানো ইত্যাদি। ওই পদ্ধতির সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না করেই প্রচার করা হল এসব হল প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক [২,১২]।

রাসায়নিক উপায়ে ফসল উৎপাদনে জোর করে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই নিয়ে এখন বহু চর্চা হচ্ছে। জৈব বৈচিত্র ধ্বংস নিয়ে প্রতিটি সভ্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা) উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ এই জৈব বৈচিত্র্যই দেশের খাদ্য সুরক্ষার স্তম্ভ [১,২,৫,১০(১)]। এদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লুটিও'র বিশ্বায়নের যুগে বীজেরপর অধিকার কৃষকের থাকছে না। বিভিন্ন দেশজ ভেষজ উদ্ভিদের দ্রব্যগুণের উৎপাদিত পণ্যের এবং দেশজ জ্ঞানের পেটেন্ট নেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে —বেশিরভাগই বিদেশি কোম্পানির দ্বারা। জলের ও নদীর ব্যক্তিগত মালিকানা হচ্ছে। বাজার, সরকারের হাত থেকে কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে। কৃষিতে ভরতুকি কমছে [১২,১৩]। চালু হচ্ছে কোম্পানির তৈরি জিন কারিকুরি করা শস্য, যার বীজ চড়া দামে প্রতি বছর কৃষককে কিনতে হবে। যদিও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে চড়া দামে জিন কারিকুরি করা শস্য (বি টি তুলো, সয়াবিন, সরষে) বীজের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষমতা নেই এবং পোকা আক্রমণ কমবে এমন দাবি করা হলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। সুতরাং বিকল্প কৃষি ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হবে, কারণ এই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা স্থায়ি নয় [১,৫, ১০(১), ১৭]।

মজার ব্যাপার হল, যারা রাসায়নিক কৃষির বড় প্রবক্তা সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিষকে এক নম্বর দূষণকারী বলে চিহ্নিত করেছে—বহু বিষই নিষিদ্ধ করেছে। ওইসব দূষণ বন্ধ করে জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছেন [১৮]।

রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার সংস্থা বা এফএও কৃষি বিষের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলার লক্ষ্যে সুসংহত উপায়ে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছেন। বিভিন্ন দেশে জৈব কৃষি ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ভারত সরকার ও জৈব কৃষির অগ্রগতির জন্য একটি পৃথক কার্যালয় চালু করেছেন। প্রকৃত চিত্রটা আজ ভয়াবহ। কোম্পানির ব্যবসায়িক বিজ্ঞান থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং 'যাহাই পাশ্চাত্য তাই উৎকৃষ্ট' এই মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে আসল বিপদকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে।

জৈব কৃষি কেন

দেশের ফসলের (শস্য) উৎপাদনশীলতা কমের দিকে এবং বর্তমান উৎপাদনশীলতা ধরে রাখাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ [১,৮,২]। সেই উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে হলে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতেই হবে। ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুস্থায়ী উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে সমস্ত সদস্য দেশগুলিকে। এই সুস্থায়ী উন্নয়ন হল এমন একটি অবস্থা যেখানে — বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে খাদ্য, জ্বালানি, গোখাদ্য ও সামগ্রিকভাবে মানব উন্নয়ন ধারাবাহিক হয়। জৈব চাষ পদ্ধতি এই স্থায়ি উন্নয়নের সহায়ক এবং ফলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে জৈবচাষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে এই কৃষি চালু হয়েছে। এই পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত বিকল্প ব্যবস্থায় ফলন

ধারাবাহিক হতে শুরু হয় এবং ভবিষ্যত খাদ্য সুরক্ষার দিক নির্দেশ করে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারতে জৈব কৃষি কোনো নতুন বিষয় নয় এবং ভারতের বেশিরভাগ জমিতে এখনও জৈব পদ্ধতিতে চাষ হয়।

জৈব কৃষি কী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সূত্র অনুসারে ' জৈব কৃষি এমন এক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে কৃত্রিম রাসায়নিক সার, বিষ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনা শস্য পর্যায়, মিশ্র ফসল, ফসলের অবশিষ্টাংশ, মৃত্তিকা আচ্ছাদন ফসল, কৃষি বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক বেশি ফলন উপযোগী ও রোগ পোকা সহনশীল ফসলের জাত, বিভিন্ন ধরনের জৈবসার, রোগপোকার জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈবিক ও দেশজ বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল — যাতে মৃত্তিকা জৈবিক ভাবে সক্রিয় থাকে এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদকে খাদ্যের জোগান দিতে পারে[১৮]। জৈব কৃষি রাসায়নিক কৃষির মত কতকগুলি সরলীকৃত কৃষি প্রযুক্তির সমাহার নয়। রাসায়নিক সারের আনুপাতিক হারে জৈবসার প্রয়োগও নয় বরং সামগ্রিক এক কৃষি পদ্ধতি যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হবে। কী উপকরণ লাগছে বড় কথা নয় — পুরোটাই একটি জীবন্ত কৃষি বাস্তুতন্ত্র যেখানে মৃত্তিকার খনিজ, জৈব বস্তু, অণুজীব, কেঁচো, পোকা, উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত [১৯]।

অন্যভাবে বলা যেতে পারে — জৈব কৃষি হল জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণসহ আঞ্চলিক সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো বিঘ্নিত ও অবহেলিত কৃষি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ফের ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি যাতে প্রকৃতির সাথে তলে রেখেবিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য ধারাবাহিকভাবে কম খরচে উৎপাদন করা যায়[২০]। কৃষি বাস্তুতন্ত্র হল — কোনো কৃষি খামারের সব ধরনের পোকামাকড়, ছত্রাক, মাটির অণুজীব ফসল, পাখি, অন্যান্য প্রাণি ও পারিপার্শ্বিক জড় পদার্থের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে ওঠে। সুতরাং জৈব কৃষির অর্থ শুধু জৈবসার দিয়ে চাষ করা নয় বা রাসায়নিক কৃষির মত অতি সরলীকৃত পদ্ধতিও নয়। যাঁরা এই সত্য মানতে পারছেন না তাঁদের হয়ত ১৯৬৫ সালের সময়ের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই এবং ওই উন্নত চাষ পদ্ধতির [২১] অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্লেষণ করার মানসিকতা নেই, নিজেরা হাতে কলমে চাষ করে দেখেননি অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বা সহজলভ্য হয়নি।

গম + সরিষা	সরিষা - বাধাকপি
বেগুন + সয়াবিন / বরবটি / মটর	আউশ ধান + অড়হর / বাজা/বিউলি
ভুট্টা + কুলতী	গম + ছোলা
অড়হর + মুগ	আখ + আদা / হলুদ
টমেটো + রসুন / পেঁয়াজ / বরবটি / মটর	ধান + মাছ / হাঁস

বিভিন্ন ধরনের ধানের চাষ — শস্য পর্যায়ের উদাহরণ বা ফসলের ধারাবাহিকতা

মুগ / পাট — আমন ধান — গম + সরষে / আলু + সরষে / মটর
পাট — আমন ধান — সবজি + ডাল শস্য + তেলবীজ
তিল / প্রাক খরিফ সবজি / বাদাম — আমন ধান + মাছ / সবজি
শন / মুগ / বরবটি + ধনচে — আমন ধান — খেসারি + ছোলা / মুসুর + তৈলবীজ / মটর/ সবজি

পদ্ধতি

রাসায়নিক কৃষি থেকে চট করে জৈব খৃষিতে যাওয়া যাবে না। প্রথমদিকে অর্থাৎ যতক্ষণ না মাটির নিজস্ব জৈবিক সত্ত্বা ফিরে আসছে সেই সময়টুকু জৈব খামারে ফলন কমলেও পরে ফলন ধারাবাহিক হবে। রাসায়নিক কৃষির মত জৈব কৃষিতে জমিতে এক ধরনেঅর্থাৎ শুধু বেগুন বা টমাটো বা গমখেত নয় এবং একই ধরনের ফসল একই জমিতে পরপর চাষ করা নয়। আবার অধুনা প্রবর্তিত শস্য বৈচিত্রকরণ মানে বোরোর পরিবর্তে শুধু গম বা সরষে নয় (অবশ্য আগে কৃষি বিভাগ শস্য পর্যায়, মিশ্র ফসলের ওপর

যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন)। একই মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল থাকলে রোগ-পোকা, আগাছা কম হয়। মাটির ক্ষয় কম হয়। আচ্ছাদন ফসল যেমন মুগ থাকলে জমির রস শুকিয়ে যায় না। একটি গভীর শিকড় ও একটি অগভীর শিকড়যুক্ত ফসল জমিতে থাকলেউদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।ভারতের উত্তর পুর্বাঞ্চলে জঙ্গল পুড়িয়ে ১ বছরের জন্য ঝুম চাষে প্রায় ৩০টি ফসল উৎপাদন করা হয়। এই চাষে রোগপোকা লাগে না বললেই চলে। ফসল উৎপাদনও ধারাবাহিক থাকে[৩৪]। শিকড়ে অর্বুদ হওয়া ডাল জাতীয় শস্যের সঙ্গে ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে।

অন্য কয়েকটি মিশ্র ফসলের উদাহরণ

রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এইভাবে চাষ করলে কৃষক লাভবান হবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সার ও বিষ ছাড়া মিশ্র ফসলে উৎপাদন ক্ষমতা জাতীয় গড়ের থেকে বেশি[২৩]। একটি জমিতে যত বেশি ধরনের ফসল থাকবে ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা তত বাড়বে[২৪]।

রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য দামী বিষ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। জৈব উপায়ে ফসল হলে ফসলের পোকা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আইপিএমের পদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে রাসায়নিক বিষের প্রয়োজন হয় না। আইপিএম পদ্ধতি কৃষি বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। তাই এই পদ্ধতিকে কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত করতে হবে। বিভিন্ন ভেষজ ও দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগ করেও রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাটির জৈবিক সত্তা

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার বেশি প্রয়োজন। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ হেক্টর জমি অনুর্বর হওয়ার জন্য দায়ী রাসায়নিক সার। রাসায়নিক ও বাণিজ্যিক কৃষিতে মাটিকে জীবন্ত ধরা হয়নি। আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে এবং রেললাইনের ধারে অজস্র গাছগাছালি আপনভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠে - সার, বিষ, সেচ, জমি কর্ষণ কিছুই লাগে না। একে অপরকে সুরক্ষাও দেয়। উদ্ভিদ খাদ্য ধারাবাহিকভাবে জোগান দেওয়ার ক্ষমতা বজায় থাকে। মাটির এই খাদ্য জোগান দেওয়ার পদ্ধতি বড়ই জটিল ও রহস্যময় যা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। পলি মাটিতে বেড়ে ওঠা গাছে শিকড়ের চারপাশে খাদ্য জোগান দেওয়ার জন্য কর্দম কণার পরিমাণ বেড়ে যায় আবার এঁটেল মাটিতে উদ্ভিদ শিকড় থেকে একরকম রস বের হয়ে শিকড় বৃদ্ধির উপযোগী করে তোলে। বড় বড় বৃক্ষে তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, ধান, গমের শিকড়ের সঙ্গে থাকা ভ্যাম (vam) ছত্রাক গাছকে উদ্ভিদ খাদ্য জোগান দেয় শিকড়ের কোনো ক্ষতি না করেই। ১ গ্রাম মাটিতে প্রায় কোটি খানেক বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থাকে। প্রজাতির বিচারে এই ধরনের প্রায় ১ লক্ষ অণুজীব বিদ্যমান। প্রত্যেকটি সম্বন্ধে এখনও জানা যায় নি। এই জীবাণু ও ছত্রাক মাটির জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে বংশবৃদ্ধি করে এবং এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ খাদ্য সহজলভ্য হয়। যেমন শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের অর্বুদ বা গুটি (যেখানে রাইজোবিয়াম নামের অণুজীব বাস করে যা) মাটির মধ্যে থাকা বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে রাসায়নিক নাইট্রোজেনের পরিবর্তন ঘটায় এবং এই নাইট্রোজেন গাছ গ্রহণ করে।

আবার শিকড় অঞ্চলে মুক্ত অণুজীব অ্যাজোটোব্যাক্টর ও অ্যাজোস্পিরিলাম বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে গাছকে জোগান দেয়। অবার সাধারণত ফসফেট মাটিতে এমন অবস্থায় থাকে যা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। মৃত্তিকায় এক ধরনের অণুজীব থাকে (যা ফসফো সল্যুবিলাইজিং ব্যাকটেরিয়া বা পিএসবি নামে পরিচিত তারা) ওই আবদ্ধ ফসফেটকে গাছের গ্রহণযোগ্য ফসফেটে পরিণত করে গাছকে জোগান দেয়।

এছাড়া মাটিতে জন্মানো (জলজ জমিতে) নীলাভ সবুজ শ্যাওলা, এক ধরনের ফার্ণ (অ্যাজোলা) বিঘা প্রতি ৮ কেজি - ১০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোগ করতে পারে। ধনচে জাতীয় সবুজ সার ও সবুজ পাতা সার (গ্লিরিসিডিয়া) ইত্যাদি বিঘা প্রতি প্রায় ১০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোগ করতে পারে। তুঁত ও পাট পাতাও জমিতে নাইট্রোজেন সংযোগ করতে পারে। এই সব জৈব পদার্থ পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে হিউমাসে পরিণত হয়। এই হিউমাসই মাটির প্রাণস্বরূপ।

জমিতে ফসলের পাতা, ডালপালা,

ছাল ও 'অপ্রয়োজনীয়' উদ্ভিদ (যাদের আমরা আগাছা বলে ডেকে থাকি তারাও) জমিতে জৈব পদার্থ যুক্ত করে। জমিতে যত বেশি জৈব পদার্থ থাকবে জীবাণু তত বেশি কার্যকরী হবে এবং উদ্ভিদ খাদ্যের স্বাভাবিক জোগান অব্যহিত থাকবে। জৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত জৈব কার্বনের মাটিতে উপস্থিতির পরিমাণ ইদানিং ০.৪শতাংশ বা তার কম অর্থাৎ মাটি মৃতপ্রায়। মাটিতে জৈব কার্বনের উপস্থিতি ন্যূনতম ০.৬ শতাংশ থাকা প্রয়োজন জীবাণুর কার্যকারিতার জন্য। সামগ্রিকভাবে মাটিতে জৈব পদার্থ ৫ শতাংশ থাকা প্রয়োজন - সেই পরিমাণও কমছে। প্রতি হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি মিলিয়ে প্রায় ১০ কোটির বেশি কেঁচো থাকার কথা যাতে সারা বছরে প্রায় ৩ টন কেঁচোর মল হিসেবে উর্বর মাটি পাওয়া যেতে পারে যাতে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশ এর পরিমাণ প্রচলিত জৈব সারের থেকে বেশি থাকে। শুধু তাই নয় এর দেহ নিঃসৃত রস ও জীবাণু দেহের পচনের ফলে তৈরি হওয়া বিভিন্ন উৎসেচক, হরমোন ও ফেনোলিক যৌগ গাছের বৃদ্ধি ও রোগ পোকা প্রতিরোধে সাহায্য করে। উচ্চ ফলনশীল ধান, গম ও সবজি ও শংকর (হাইব্রিড) জাতের ফসলের উদ্ভিদ খাদ্যের চাহিদা বেশি এবং এর জন্য প্রচুর জল ও রাসায়নিক সার ও কৃষি বিষের প্রয়োজন।

কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা ডাঃ আর এইচ রিচারিয়া দেশজ উন্নত জাতের ধান চাষের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু ধানের জাত পেয়েছিলেন যাদের ফলন ৩০০০-৭০০০ কেজি প্রতি হেক্টরে। এই ধরনের ধানে বাইরের দামী রাসায়নিক উপকরণ লাগে না। বর্তমানে উচ্চফলনশীল ধান শুধুমাত্র আদর্শ মৃত্তিকায় যেখানে সেচ, সার, বিষ প্রয়োগ করা হয় সেখানেই ভাল ফলন দেয়। সমস্যাবহুল অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ধানে উচ্চফলন হয় না [১১]।

জৈব সার রাসায়নিক সারের প্রভাবে দ্রুত নিঃশেষিত হয়। মাটির অণুজীবের সংখ্যা কমতে থাকে মারাও পড়ে। ক্রমাগত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটির কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতের তারতম্য ঘটে বিশেষত আমাদের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে। শীতপ্রধান দেশে রাসায়নিক সারের কুপ্রভাব অনেক ধীরে হয়। মাটি ক্রমশ নিস্ফলা হয়। তাই এখন বাইরের থেকে জীবাণু সার ও বাইরের তৈরি কেঁচো সার জমিতে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। জমিতে কেঁচো ও অন্যান্য অণুজীবের সঙ্গে কৃষি বিষ ও রাসায়নিক সারের সহবস্থান সম্ভব নয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে, বিশেষত নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগের ফলে, উদ্ভিদের শিকড়-অঞ্চলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রোগ পোকা প্রতিরোধক্ষম যৌগের অভাব ঘটে - উদ্ভিদ সহজেই রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রাসায়নিক কৃষিতে উদ্ভিদ খাদ্যের অপসারণের যুক্তি দেখিয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। যখন অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগেও ফসলের উৎপাদন কমতে থাকে তখন ওই যুক্তি অনুযায়ী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা কি যুক্তিযুক্ত ? সাধারণ জ্ঞান কি বলে ? মৃত্তিকা একটি কারখানা নয় আর ফসল উৎপাদনের জন্য বহু প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা দায়ী। প্রথমদিকে রাসায়নিক সার প্রয়োগে বেশি ফলন পাওয়া গেলেও কিছু দিন পরে ফলন কমতে থাকে এমনকি আগের থেকে বেশি পরিমাণ সার ব্যবহার করলেও এই ঘটনা ঘটে। ইংল্যান্ডে ১৫০ বছর ব্যাপী এক স্থায়ী কৃষির পরীক্ষায় দেখা গেছে মাটিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে [২৯]। আরো একটি ১৭ বছর ব্যাপী পরীক্ষায় দেখা গেছে শুঁটি জাতীয় গোখাদ্য ক্লোভার নিয়মিত কাটার পরেও ১০ টনের বেশি ম্যাগনেসিয়াম পটাশ, ফসফরিক অ্যাসিড ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে মৃত্তিকা থেকে আহরিত হয়েছে অথচ মৃত্তিকায় ওই পরিমাণ খাদ্যের উপস্থিতি মাটি পরীক্ষায় ধরা পড়েনি [৩০] — এটা কিভাবে সম্ভব হল ? বিশুদ্ধ জলে বীজ ভিজিয়ে রাখার পর ওই জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পটাশ, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ বীজে থাকা পরিমাণের থেকে বেশি। কোনো উদ্ভিদ না থাকা অবস্থায় মাটি পরীক্ষা করা হল এবং স্বাভাবিকভাবে ওই জমিতে উদ্ভিদ জন্মানোর পর মাটি পরীক্ষায় দেখা গেল, আগের থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ জমিতে পাওয়া যায় [৩০]। ফুলিয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জৈব কৃষি খামারে বিগত ৩ বছরের মাটি পরীক্ষায় অনুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

সাফল্য

সারা পৃথিবী এখন রাসায়নিক সার ও

কৃষি বিষের দূষণে নাজেহাল। বিদেশে আমাদের দেশের থেকে বেশি রাসায়নিক ব্যবহার হলেও বহু দেশই সুস্থায়ী কৃষির উপর জোর দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ এখন যথেষ্ট খাদ্য ও পরিবেশ সচেতন। জৈব উপায়ে উৎপাদিত ফসলে ভিটামিন, শর্করা ও ক্যান্সার প্রতিরোধক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে থাকে[২০]। বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ আকর্ষণীয়, বেশি দিন ঘরে রাখা যায় এবং বাজারে এর চাহিদা বাড়ছে। এভাবে ফসল চাষে কৃষকের খরচ কমে, পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের রোগব্যাধি হ্রাস পাবে। সর্বোপরি যা ভবিষ্যৎ খাদ্য সুরক্ষার সহায়ক। দিল্লিতে ও বাঙালোরে জৈব বাজার তৈরি হচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি সচেতন নাগরিক এর পক্ষেই রায় দেবেন।

কিউবা বিগত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাসায়নিক কৃষিকে জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে। সারা পৃথিবীতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত[৩২,৩৩]। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (৯০ লাখ হেক্টর), অস্ট্রেলিয়ায় (৭৭০ লাখ হেক্টর), ইতালীতে (১০০ লাখ হেক্টর), ইংল্যান্ডে (৫০ লাখ হেক্টর) এবং জাপান ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে জৈব কৃষির এলাকা বাড়ছে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরাঞ্চল কৃষি বিভাগ জৈব কৃষির ওপর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রক বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্প চালু করেছেন যার উদ্দেশ্যই হল সুস্থায়ী কৃষির অগ্রগতি। রাজ্য সরকারও জৈব কৃষির জন্য উৎসাহ ভাতার মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতি চালু হয়েছে।

করণীয় — অনেক সচেতন কৃষক বন্ধু নিজের খাওয়ার বেগুন ও অন্যান্য সবজিতে বিষ প্রয়োগ করেন না। চট করে সব রাসায়নিক সার ও কৃষিবিষ বর্জন করা সম্ভব হবে না কারণ বিষ ও সারের ওপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। যাঁরা দ্বিধা কাটিয়ে উঠবেন তাঁরাই এই পদ্ধতি দ্রুত অবলম্বন করে লাভবান হবেন। আমাদের রাজ্যে ৯০ শতাংশের বেশি জমি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ছোট জোতে উৎপাদনশীলতা এবং মিশ্র ফসল হওয়ার সুযোগ বেশি। আপাত দৃষ্টিতে ফলন প্রথমদিকে কম হলেও পুষিয়ে যাবে কারণ বাইরের দামী কৃষি উপকরণ প্রয়োগ না করার ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক লাভ হবে এবং কয়েক মরশুম পরে ফলনের ধারাবাহিক দেখা যাবে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে — কৃষককে জৈব কৃষির জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী কৃষি গবেষণা শুরু করা যাতে কম খরচে পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে কৃষকরা ধারাবাহিক উৎপাদন পেতে পারেন।

এলাকার মাটি ও জলবায়ু অনুযায়ী দেশজ উন্নত জাত ব্যবহার করা, এর সঙ্গে একটি বা দুটি ফসল মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করতে হবে এবং শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি যেখানে কৃষি সেখানে দেশজ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা এবং জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমেই কৃষিজ উন্নয়ন সম্ভব।

গ্রীষ্মকালে আচ্ছাদন ফসল যেমন মুগ, বরবটি, ধনচে ইত্যাদি জমিতে চাষ করা, অভাবে শুকনো ঘাস, খড়, ফসলের অবশিষ্টাংশের মাধ্যমে জমিতে আচ্ছাদন করা যেতে পারে। এতে উর্বরতা ও মাটির রস বজায় থাকবে।

জমি অধিক কর্ষণ না করা, যতটুকু না করলে নয় ততটুকু করতে হবে। অধিক কর্ষণে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় এবং মাটি শক্ত হয়। ভূমিক্ষয় বন্ধ করা এবং জমির ওপরের অংশ চেঁছে ফেলে না দেওয়া।

যারা মনে করছেন জৈব বা সুস্থায়ী চাষে ঝুঁকি রয়েছে তারা জমির নির্দিষ্ট কোনো একটি ছোটো অংশে কোনো বিষ ও সার প্রয়োগ না করে ফসল ফলানোর পরীক্ষা করতে পারেন। এবং লাভজনক মনে হলে ধীরে ধীরে এই চাষের জন্য জমির পরিমাণ বাড়াতে পারেন।

জমিতে গোবর সার, মুরগীর বিষ্ঠা, কম্পোস্ট, কচুরিপানা কম্পোস্ট, কেঁচো সার, অ্যাজোলা, নীল-সবুজ শেওলা, সবুজ পাতা সার (গ্লিরিসিডিয়া, তুঁত পাতা, পাট পাতা ও অন্যান্য পাতা জমিতে ছড়ানো), সবুজ সার (ধনচে), জমাট বাধা রক্তসার, হাড়গুঁড়ো, ডিমের খোসা ও মাছের আঁশের কম্পোস্ট, মাছ ধোয়া জল, পুকুরের পাঁক, ধান মিলের কালো ছাই, কাঠের ছাই, খোল ইত্যাদি জমিতে প্রয়োজন মত প্রয়োগ করা। রক ফসফেট (নাইট্রোজেন ছাড়া ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম অন্যান্য অণুখাদ্য পাওয়া যায় যা) বিঘে প্রতি ২০ কেজি ২ বছর অন্তর প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমাদের

স্থানীয় সবজি ও মাছের বাজারের উচ্ছিষ্ট মাছের আঁশ, কাঁটা, সবজির পাতা ইত্যাদি নষ্ট না করে পচিয়ে ভাল সার তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। জৈব পদার্থেরও অভাব নেই। অভাব ব্যবহারের মানসিকতার। কেঁচোসার ৫০ কেজি হিসেবে বিঘায় প্রয়োগ করলে ফসলের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হয় এবং চাপান হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে (ব্যক্তিগত যোগাযোগ অধ্যাপক মহাদেব প্রামাণিক, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।

তরলসার — বড় জালায় ৩০ লিটার জলে ২ কেজি গোবর, ২ লিটার গোচনা, ৫০০ গ্রাম নিমখোল, নিম, আতা ও বাসক পাতা প্রতিটি ২৫০ গ্রাম দিয়ে একমাস পচাতে হবে। ছেঁকে নিয়ে ওই দ্রবণ স্প্রে করলে ফসলের রোগপোকা কম এবং ভালো বৃদ্ধি হয়। এটা একটি দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের নমুনা [৩১]। প্রসঙ্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য রসুনকে বহুদিন পূর্বেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে [২]। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য আখের ছিবড়ে জাত এন-ট্রায়কন্টানল নামক জৈব রাসায়নিক স্প্রে করা ছাড়াও বহু পরীক্ষিত পদ্ধতি রয়েছে।

জীবাণুসার — নাইট্রোজেনের জন্য ১ কেজি ৫০০ গ্রাম অ্যাজোসস্পাইরিলিয়াম (ধানজাতীয় ফসলের জন্য) / অ্যাজোটোব্যাক্টর ২৫ কেজি গোবর সারের সঙ্গে মিশিয়ে ৭ দিন ছায়ায় রাখার পর ১ বিঘে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।এতে বিঘেতে প্রায় ১০-১৫ কেজি নাইট্রোজেন যুক্ত হবে।

একইভাবে ফসফেটের জন্য পিএসবি অণুজীব ওপরের পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। এতে বিঘে প্রতি ২০ কেজি ফসফেট যুক্ত হতে পারে। পটাশ দ্রবীভূতকারী অণুজীবও বাজারে আসছে।

শুঁটি বা ডাল জাতীয় ফসলের ভেজানো বীজে রাইজোবিয়াম প্রজাতির অণুজীব মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এতে উদ্ভিদ স্বাভাবিক উপায়েই নাইট্রোজেন পায়।

রাসায়নিক সার প্রয়োগে কত সংখ্যক কেঁচো ও জীবাণুর বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও কত সংখ্যক মারা যায় তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে রাসায়নিক সার প্রয়োগে জীবাণুর কার্যকারিতা যে হ্রাস পায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই জন্যই জীবাণু সার বাইরের থেকে প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যদি মাটিতে রাসায়নিক সার, বিষ প্রয়োগ করা না হয় তা হলে মাটিতে এইসব জীবাণু ও বহু ছত্রাক - ট্রাইকোডারমা ভিরিডি, ট্রাইকোডারমা হারজেনিয়াম, আসপারজিলাস নাইজার, অ্যাসপারজিলাস আওয়ামারি এবং সিওডোমোনাস ফ্লোরেসেন্স ইত্যাদি চাষের বন্ধুর সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। মাটি, বাস্তুতন্ত্রের জৈবিক সত্ত্বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর এইসব অণুজীবদের প্রয়োগ নিয়মিত না করলেও চলবে। উৎপাদন বাড়ানো দূরের কথা মাটিই যদি জীবিত না থাকে ফসল উৎপাদন হবে কীভাবে? । মাটি হল মা। আসুন আমরা সবাই এই মাকে সুস্থ করে তুলি ও রক্ষা করি।

তথ্য সূত্র

০১. শিবা বন্দনা ২০০১ The Violence of the Green Revolution, RFSTE,New Delhi

০২. দুদানি এ টি ১৯৯৯, Alternative to Chemical Pesticides in Tropical Countries - Sustainable Agriculture-Food Security & Food Safety, Bigyan Prassar, New Delhi

০৩. সেন অর্মত্য ২০০৪, উন্নয়ন ও সক্ষমতা, (অনুদিত - অরবিন্দ রায়) আনন্দ পাবলিশার্স

০৪. সেন অর্মত্য ১৯৮১, Proverty & FaminesAn Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford,Clarenden Press. London.

০৫. দেব দেবল ২০০৪, Indistrial vs Ecological Agriculture, Navdanya, New Delhi

০৬. দেব দেবল ২০০০, লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি, উৎস মানুষ, কলকাতা

০৭. অ্যালভারেস ক্লড (সম্পাদিত) ২০০২, The Philosophy and Ethics of Organic Fanning in the Organic Farming Reader, Other India Press, Goa

০৮. (ক) কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক, 1994 (I, II, III), Watershed Area Rainfed System Analysis, (guide line), New Delhi

খ) মার্কস কার্ল ১৮৮৭, Capital Vol-I, Progressive, Publishers, Moscow (PP 475)

গ) দেব দেবল ২০০৫, উন্নয়নের পুরাকথা, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা

০৯. চট্টোপাধ্যায় অতীশ ১৯৯৯, পরিবেশ চিন্তা - বিজ্ঞান থেকে দর্শন, গণশক্তি

১০. আগরওয়াল এস এন ১৯৮৬ Population NBT (০১) Gene Flow 2002, 2003, 2004, Consultative Group of Agricultural Research, Rome.

১১. দেব দেবল ২০০১, Folk Rice Varieties of West Bengal Agronomical & Morphological characteristics, Navdanya. New Delhi.

১২. চ্যাটার্জী দেবী ২০০২, বিশ্বায়ন ও দলিত সমাজ অমিয় কুমার বাগচী সম্পাদিত বিশ্বায়ন-ভাবনা ও দূর্ভাবনা, ২০০১, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, চট্টোপাধ্যায় অতীশ, ১৯৯৯, পরিবেশ চিন্তা, গণশক্তি

১৩. শিবা বন্দনা ২০০২, Corporate Hijack of Water, Navdanya, New Delhi

১৪. কনওয়ে গর্ডন ২০০০, Genetically modified crops : risk & promises Conservation Ecology (www.consecoi.org./vol4/issl/

১৫. দেব দেবল ২০০২ অগস্ট, চুক্তিভিত্তিক চাষ ও প্রযুক্তি প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন - অনীক

১৭. স্বামীনাথন এম এস ২০০১ The balance sheet - optimism (interview) Frontline Feb 2.

১৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (USDA) ১৯৮০, The Report & recommendations on Organic farming, US Govt. Printing Press, Washington. «www.usda.gov»

১৯. ল্যামকিন এন এইচ ও এস প্যাডেল ১৯৯৪, Organic Farming & agricultural policy in Western Europe on our view (the economics of organic farming - an international perspective (eds NH lampkin & S Padel), পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৫৬, সি এ বি ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ালিংফোর্ড।

২০. শিবা বন্দনা, পি পাণ্ডে ও জে সিং ২০০৪, Principles or Organic Farming,Navdanya, New Delhi.

২১. হাওয়ার্ড স্যার অ্যালবার্ট ২০০০, An Agricultural Testement, Other India Press, Goa.

২২. ম্যারান গুডাকিস, মানুসস্ ২০০১, The mediaval roots of our Ecological crisis, Environmental Ethics, 23: 243-260

২৩. ম্যাডেন জে প্যাটরিক ও পি ও কর্নেল ১৯৮৯, Early Results of the LISA programme Agricultural Libraries Intraction Notes, USDA, 15(6/7) : 1- 10

২৪. হেফারম্যান ডব্লু ডি ও জি পি গ্রিন ১৯৮৬, Farm size & soil loss: prospects for a sustain able agriculture Royal Society. 51: 31-32.

২৫. ধালিওয়াল জি এস এবং রমেশ অরোরা ২০০৪, Intregrated Pest Management - Concepts and Approches, Kalyani Publishers

২৬. থমকিনস্ পিটার এবং ক্রিস্টোফার বার্ড ২০০৪, The Secrets of Soil, Rupa

২৭. গ্রিন ল্যান্ড ডি জে ১৯৭৯, The Physics and Chemistry of the Soil, Roots Interface, Edited by J L Harley and R Scott Russel, Academic Press, London, New York pp 83-98

২৮. (ক) ক্যালট জি ১৯৮২, Les intractiones. Sol.racin Editur.INRA, pp 271-299

অ্যালভারেস ক্লড (সম্পাদিত) ২০০২, organic farming reader other India press, Goa.

খ) ডোগরা ভরত ২০০০, The Life and works or Dr. R. H. Richaria, ডোগরা ভরত ৬-২৭ রক্সাকুঞ্জ, পশ্চিম বিহার, নতুন দিল্লি

২৯. জেনকিনসন ডি-এস, এন জে ব্রহ্মচারি এবং কে কোলম্যান ১৯৯৪, How the Rothamstead classical experiments have been used to develop and test models for the turnover of Carbon and Nitrogen in Soil 22: 117-128 in R A Leigh & A E Johnson (eds) Long Term Experiments in Agticultural and Ecological Sciences, Wallingford, CAB International

৩০. ডেক্লার্ক বার্নাড ২০০২, Organic farming and the soil in organic farming Reader (ed : claude Alvers) other India Press, Goa.

৩১. তরলসার প্রচারপত্র ২০০০, সার্ভিস সেন্টার, গড়িয়াহাট, কলকাতা

৩২. রুন্ডগ্রিন গুনার ২০০২, Organic Agriculture & food Security, IFOAM Dossier-1, Theley, Germany, International Federation of Organic Movements.

৩৩. উইলার এইচ এবং এম উইসেফি ২০০২, Organic Agriculture Worldwide, 2002 - Statistics prospects, IFOAM, ISBN 3- 934499-42-2

৩৪) মার্টন ওলে ২০০২, The relationship between fallow Length Crop Yields in shifting Cultivation : a Rething Agroforesty System,

২০-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগর, নদীয়া কৃষিমেলা উপলক্ষে লেখাটি তৈরি করা হয়েছিল।

প্রকাশিত হয়েছে

সুস্থায়ী খামার তৈরি করার নিয়ম নীতিগুলো কি কি ? সুসংহত খামার তৈরি করতে গেলে কি কি ধরনের প্রযুক্তি বা নকশা ব্যবহার করবেন ? কোন কোন নকশা আপনার জায়গার পক্ষে উপযোগী ? বায়োফার্ম বুকলেটের ৬ নং পুস্তিকাটি এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছে।

ভারতের নয়া বাদশাহী চাল

দেবিন্দর শর্মা

এক অদ্ভুতব্যাপার ! স্বাধীনতার আগে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে ৫৫৪টি সামন্তরাজ ছিল, স্বাধীনতার পর এই সমস্ত রাজ্যপাটকে এক জাতি এক দেশ-এর পতাকাতলে আনতে সময় লেগেছিল ১৫ বছর। যে কাজ শুরু হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের উদ্যোগে। অথচ কী আশ্চর্য ব্যাপার, এখন তারই ৪৫ বছর পর অর্থাৎ স্বাধীনতার ৬০ তম বর্ষে, সেই একই সংখ্যক নতুন নতুন রাজ্যপাট সারা ভারত জুড়ে আবার তৈরি হতে চলেছে।

তবে আগের সঙ্গে এখনের একটাই তফাত আছে। তফাত নামে। এইসব ছোট ছোট সাম্রাজ্যের গায়ে এক চমকদার নাম লাগবে। যাকে বলা হবে সেজ। খুলে বললে হবে স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এই সব ছোট ছোট জায়গীর জাত-কুল-গোত্রে একেবারে অন্য মর্যাদা পাবে। চাল চলন আদব কায়দায় যাকে বলে, একেবারেই স্বতন্ত্র। দু একটা ছোটখাট উদাহরণ দিই, যেমন এদের নিজস্ব মুদ্রা থাকবে, ব্যবসার ঝুট ঝামেলার বিহিত করতে থাকবে নিজেদের বিশেষ আদালতও। সবমিলে কম বেশি এখানে রাজার শাসনই বহাল

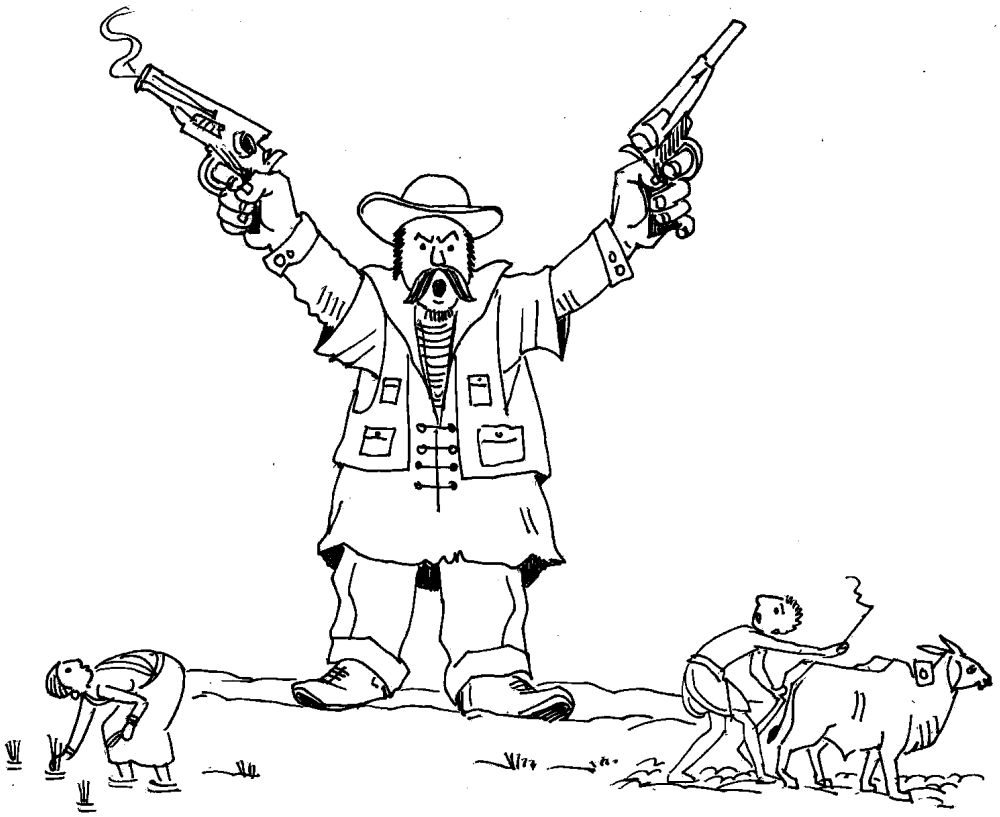

হবে।

কোনো সরকারি অনুদান রাজ্যগুলোয় এরা পাবে কিনা, এরকম করে জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। আরে, এইসব সেজ আদপে হবে, এক একটি শুল্ক-মুক্ত মুক্তাঞ্চল। এদের কাস্টমস, আবগারি, বিক্রয় কর, অক্টরই, মান্ডি, টার্নওভার ট্যাক্স কিছুই দিতে হবে না।

এমনকি আগামী ১০ বছরের জন্য, আগাম আয়কর মুকুবের কথাও বলে দেওয়া আছে। আয়কর ছাড়া আছে পরিকাঠামোর জন্য মূলধনী তহবিল (Infrastructure Capital Fund)। থাকবে দিনভর ২৪ ঘন্টা যথেচ্ছ জল ও বিদ্যুৎ পাবার অধিকার। এমন কি এই সেজ মনিবরা ইচ্ছে করলে ১০০ ভাগ বিদেশি বিনিয়োগও আনতে পারে, কোনো বাধা নেই। আর সেজএলাকাগুলি থাকবে, তার চারপাশের পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের উর্ধ্বে।

ভূমি অধিগ্রহণ

এরপর যে রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলো একের পর এক কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে তা সেজ-এর জন্য থালায় করে সাজিয়ে দেবে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? অনেক মুখ্যমন্ত্রীই তাঁর রাজ্যে 'সেজ এর আদর্শ পরিবেশ' -এর আশ্বাসকে সামনে রেখে, এইসব উদ্যোগের জন্য মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন ধরুন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী স্ব-উদ্যোগে এক শিল্পপতিকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে, একেবারে মুম্বাই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আর গুজরাট সরকার তার রাজ্যের জন্য সেজ এর লগ্নী খুঁজতে একটা দলকে তো একেবারে বিদেশেই পাঠিয়ে দিলেন। ওড়িশা আবার, আরও এককাঠি সরেস। তাঁরা তাঁদের 'তফশীলভুক্ত জনজাতি স্থাবর সম্পত্তি আইন' সংশোধনের তাল করছেন। যাতে বাইরের লোক এসে জনজাতিদের জমি সহজে কিনতে পারে। আমাদের কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, টাটা, আম্বানী, মিত্তল বা অন্য কারোর যে চাষজমিই মনে ধরবে সেটাই তাকে শিল্প করতে দিতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রী কমলনাথতো ইউরোপের দেশগুলোয় সেজ-এর জন্য শিল্পদ্যোগী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আসলে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আখড়া করে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, সেখানে তাঁর একটা বড়সড় দায়িত্ব আছে।

আপনি একে খুব সহজেই এই শতাব্দীর জমি দখলের সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে উল্লেখ করতে পারেন বা একে দিনে ডাকাতিও বলতে পারেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়নি, ফারাক এই যা। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই সময়ে সেজ যে কত জরুরি সেকথা একবার নয়, বহুবার বলেছেন। হঠাৎ কমে আসা কৃষিজমি কোন মন্ত্রে যেন পরিমাণে অঢেল হয়ে গেছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ যে কমতে কমতে ০.২৫ একরে এসে দাঁড়িয়েছে সে কথা অনেকেরই মনে হয় মনে নেই। সরকার যে, ড্রাকেনিয়ান জমি অধিগ্রহণ আইন বলবত করে জমি নিতে চাইছে, তাঁকে একথা স্মরণ করানো দরকার।

প্রথম ধাপে অধিগৃহীত হবে ১২৫,০০০ হেক্টর একেবারে ফলন্ত কৃষিজমি। দ্বিতীয় ধাপেও নেওয়া হবে প্রায় একই পরিমাণ জমি।

বাণিজ্যমন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলোকে বলেছেন যে, তাঁরা যেন, জমি অধিগ্রহণের আগে, কৃষকদের কে জমির বাজার চলতি দাম নিয়ে নিশ্চিত করে। জমির দাম নিয়ে জোরালো প্রতিবাদের ফলেই এটা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলো শিল্পের জন্য জমি দিতে একেবারে তড়িঘড়ি উঠে পড়ে লেগেছেন। পাঞ্জাবে যেখানে পুরো রাজ্যটাতেই সেচের সাহায্যে চাষবাস চলে, সেখানে একেবারে ফলন্ত জমিগুলো সেজ এর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব এক নজির যেখানে, বার্নালায় ট্রাইডেন্ট নামের এক বেসরকারি সংস্থার জবরদখল নিয়ে কৃষকদের আন্দোলনকে সরকার ভয় দেখিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করেছিল। অমৃতসরেও সেজ নিয়ে একইরকম ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই আইন শতকরা ১০ ভাগ জমি সেজ এর আওতার বাইরে রেখেছে। তবুও একথা সত্যি যে এইসব শিল্প তালুকের অনেকগুলিই উর্বর জমির ওপর তৈরি হবে। এমনকি হিমাচলপ্রদেশে যেখানে গড়ে ০.৪ হেক্টর করে এক একটি খামার, সেখানেও কাংড়া ভ্যালিতে ৩৫,০০০ হেক্টর জমি নিয়ে সেজ করার কথা ওখানকার সরকার ভাবছে। সবচেয়ে বড় সেজগুলোর একটা তৈরি হচ্ছে মুম্বাইতে। যেখানে এইজন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ১৪,০০০ হেক্টর দোফলসী জমি। মুকেশ আম্বানী গ্রুপ

জামনগরে ৯,০০০ একর জমি নিয়েছে পেট্রো পণ্যের সেজ গড়ার জন্য। পরে আবার তারা এটাকে ১০,০০০ একর করে নেয় নানা পণ্যের উৎপাদনের জন্য। সেজ - প্রভুরা যতটা জমি চাইছেন তার থেকে সরকার শতকরা ৬৫ ভাগ জমি বেশি দিতে চাইছেন, তাঁদের বাজার, মল, রেস্তোরাঁ বা বিনোদন পার্ক তৈরির জন্য। এখনও অবধি সেজের জন্য যে ১লাখ ২৫ হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে ৩১,২৫০ হেক্টর অট্টালিকা তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। ইমারত নির্মাতার কাছে এর চেয়ে আনন্দের কী থাকতে পারে।

আরও একটা সেজ করার কথা চলছে, নতুন দিল্লির লাগোয়া এলাকা ঝাজারে। এখানে ১০,০০০ হেক্টর দোফসলী জমি সেচ করার জন্য কব্জা করা হয়েছে। গুরেগাঁও এর শহরতলী এই দুটো সেজ মিলে যতটা জায়গা নেবে, তা গুয়েগাঁও এর শহরতলী এলাকা থেকে বড়। এখন এই এলাকা দুটি কেবল খাতায় কলমে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায়। ম্যাঙ্গালোরে ওএনজিসি'র মতো সরকারি উদ্যোগও ২,২০০ হেক্টরের মতো জমি সেজ গড়তে দখল করেছে। যে জমির মধ্যে দোফসলী এমন কি তিন ফসলী জমিও আছে।

ওড়িশায় টাটা স্টিলের গোপালপুর সেজের কথাই ধরুননা। ওড়িশা সরকার ওই জায়গাটা নিয়েছিল নিজে কিছু শিল্প গড়বে বলে। তারপর জমিটা টাটাকে দেওয়া হয় ইস্পাত কারখানা করতে। কিন্তু যখন কারখানাটা আর হল না আর কৃষকরাও তাদের জমি ফেরত চাইতে শুরু করল, তখনই টাটা ঠিক করল যে, ওই জায়গায় তারা সেজ গড়বে। পসকো নামে কোরিয়ার এক নামজাদা ইস্পাত কোম্পানিও খনি থেকে কাঁচা লোহা তোলার জন্য ও ইস্পাত কারখানা গড়তে কৃষকদের প্রতিবাদকে তোয়াক্কা না করে ১,৬০০ হেক্টর জমি আত্মস্যাত করেছিল। পসকো চাইছে এই জায়গাটাকে সেজ-এ বদলে দিতে, আর রাজ্য সরকারও তাতে সায় দিচ্ছে। আগে একটা চমকপ্রদ উদাহরণ আছে, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার কলকাতার কাছে সিঙ্গুরে ৪০০ হেক্টরের মতো জমি অধিগ্রহণ করেছে, টাটাকে মোটরগাড়ি কারখানা করার জন্য দেবে বলে। আক্ষরিক অর্থে সিঙ্গুরকে যদিও সেজ বলা যায় না, কিন্তু যেটা এখানে নজর করার মতো, তা হল সরকার এই জমি নিয়েছে মোট ১.৪ বিলিয়ন টাকা দিয়ে আর টাটাকে দিয়েছে মাত্র ২০০ মিলিয়ন টাকায়। যা কিনা কেনা দামের সাত ভাগের এক ভাগ। এই টাকা আবার টাটা শোধ দেবে ৫ বছরে।

যেখানে এই বাংলার স্বনির্ভর দলের গরীব মেয়েরা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে টাকা ধার করে বছরে ১০০ টাকায় ২৪ টাকা সুদ দেন, সেখানে টাটার কাছে চাওয়া হয়েছে ১০০ টাকায় কেবল ১০পয়সা। কেরালাতেও ওখানকার কমিউনিষ্ট সরকার ওয়ের-এ সেজ করার কথা ভেবেছে।

সবার জন্য কাজ ?

এইসব বাদশাহী শিল্প উদ্যোগগুলো তৈরি হলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, এইসব বলেই এখন এই উদ্যোগগুলির পক্ষে সাফাই গাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এর ফলে নাকি ৫০০,০০০ লোক কাজ পাবে। আমাদের মতো দেশের পক্ষে, এই ধরনের কর্মসংস্থানের কী যে মানে হয়, কে জানে।

আসলে বাস্তবটা কী, আসুন একটু বোঝার চেষ্টা করি। এই শতাব্দীর শুরুতে এই দেশের ৭৫ লাখের এক জনসমষ্টি (যা সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যার বেশি) রেলের ২৮,০০০ খুবই সাধারণ বেতনের চাকরির জন্য আবেদন করেছিল। এমন একটা দেশ যে কিনা তথ্য বিপ্লবের একেবারে প্রথম সারিতে আছে, তার কাছে এই তথ্য রাশিবিজ্ঞানী ছাড়া কারোরই কোনো কাজে লাগবে না। কারণ ৭৫ লাখের মধ্যে যদি ৫লাখ লোকের চাকরি হয় তবে তাতো একেবারে সিন্ধুতে বিন্দু। অন্যদিকে যদি এই ১,৭৫০ বিলিয়ন রাজস্ব ক্ষতি ঠেকানো যেত তবে সেই টাকা দিয়ে ১০লাখের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেত। আর সরকারি উদ্যোগ লগ্নী বাড়িয়ে সেখানেও কর্মসংস্থানও বাড়তো।

আবার তথ্য প্রযুক্তির শিল্পের দিকে খেয়াল করুন, তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে কেবল ৫০০,০০০ - ৬০০,০০০ নতুন কাজ তৈরি হয়েছে। আর যে আউটসোর্সিং সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির কথা আমরা নিত্যদিন শুনে থাকি তারা কেবল ২০০,০০০ মানুষের কাজের ব্যবস্থা করেছে। তাহলে তথ্য প্রযুক্তির কোম্পানিগুলো কেন সেজ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে বলুন তো। তা

কিন্তু কখনোই অনেক লোককে চাকরি দেওয়ার জন্য নয়, বরং কর ছাড়ের এই বিশাল সুযোগ সুবিধে পাওয়ার জন্য। কর ছাড়ের যে সুযোগ ইতিমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি শিল্প পাচ্ছিল, তা ২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে আসছে। পাশাপাশি, যদি একবার চলতে থাকা চুক্তি এবং কর্মী ব্যবস্থা নিয়ে সেজ এ সরে আসা যায় তবে নতুন কর্মসংস্থানের কোনো দাবিই তারা মানবে না এবং রাজস্ব দেওয়ার দায়িত্বও এড়াতে চাইবে।

কৃষি থেকে শিল্পে জমির এই হাতবদল প্রথম যে সমস্যাটা তৈরি করবে, তা হল জীবিকা থেকে উচ্ছেদ। আমাদের হিসেব বলছে যে প্রায় ১১৪,০০০ চাষি পরিবার (পরিবার প্রতি গড়ে ৫ জন করে) ও ৮২,০০০ খেতমজুর পরিবার একই সঙ্গে কৃষি থেকে উৎখাত হবে। তার মানে চাষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রায় ১০ লাখ মানুষের (সেজ-এ হওয়া কর্মসংস্থানের দ্বিগুণ) জীবন জীবিকার সামনে অন্ধকার নেমে আসবে। খেতমজুরদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হবে। তাঁরা যে কেবল চাষের কাজ হারাবেন তা নয়, তাদের যে সেজগুলোয় চাকরি হবে এরকম ভাবনা কষ্টকল্পনার নামান্তর। তাঁরা সেজগুলোর বিশাল কর্মকাণ্ডের সামনে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকবে কাজের আশায়, আর মনে মনে পর জন্মে নীলরক্তের পরিবারে জন্মাবার স্বপ্ন দেখবেন।

এবার আসুন, জমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষজন রোজগারে কতটা ক্ষতির মুখে পড়লেন তার একটা আর্থিক হিসাব কষি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার সর্বশেষ রিপোর্ট বলছে (NSSO 2005) যে, একটি কৃষক পরিবারের গড় মাসিক আয় হল ২,১১৫ টাকা। (যার মধ্যে আছে চাষবাস থেকে আর ৯৬৯ টাকা, পশুপালন থেকে আয় ৯১ টাকা, দিনমজুরি থেকে আয় ৮১৯ টাকা এবং অন্য ব্যবসা থেকে আয় ২৩৬ টাকা)। জমি থেকে উৎখাত হলে, প্রথমেই প্রথম দুই রোজগারের পর পুরোপুরি লোপাট হবে ফলে ফি বছর এই ঘাটতি হবে ১২,৭২০ টাকা। আর বছরে ১১৪,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের মোট রোজগার ঘাটতি পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১.৪৫ বিলিয়ন টাকা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে, এইসব কৃষকদের জমি থেকে রোজগারটা, রোজগারের একটা কত বড় অংশ জুড়ে ছিল। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে যেটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু না হলে এইসব কৃষক পরিবার আবার দারিদ্রের অন্ধকারে ডুবে যাবে।

জাতীয় গ্রামীণ শ্রম আয়োগ এর মতে, একজন কৃষি কর্মী বছরে ১৫৯ দিন কাজ পায়। এবং NSSO-2005 এর মতে গ্রামে কৃষিকর্মীদের দৈনিক গড় মজুরি ৫১ টাকা। এর থেকে বোঝা যায় যে ৮২,০০০ কৃষি কর্মী পরিবার বছরে ৬৭০০ লাখ টাকার মত রোজগার হারাবে। ফলে বছরে কৃষি ও কৃষির আনুষাঙ্গিক কাজ থেকে রোজগার কমে গিয়ে ২১২ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

একজন প্রান্তিক চাষির রোজগার দারিদ্র সীমার নীচে সাধারণভাবে ঘোরাফেরা করলেও ভূমি থেকে উচ্ছেদের ফলে তাঁর অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। যতই হোক না কেন, এই ছোট্ট একফালি জমিই কিন্তু তার ভবিষ্যত নিরাপত্তা।

অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা জাতীয় স্তরে খুব একটা গুরুত্ব পায় না। নাহলে, যে কোনো সহৃদয় সরকারই যে কোনো মূল্যে তার জনসাধারণের জন্য এই কাজটির ওপর সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিত। আমাদের সমীক্ষায় আমরা দেখছি যে, যতটা জমি চলে যাচ্ছে তাতে খাদ্য উৎপাদন টাকার হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ ১.৫-৪ বিলিয়নে দাঁড়াবে। সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদন কমবে বছরে ৪০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ টন। দেখুন, এটা একটা সাধারণ হিসেব। দামি ফসলের দিক থেকে বিচার করলে এই ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি হবে। ৫ লাখ কর্মসংস্থান নিয়ে এই যে আশার বাণী, তা যদি পূরণ না হয়, তাহলে আমরা কাকে ধরবো। প্রথম কথা বাণিজ্য মন্ত্রক জানে না ঠিক কত কর্মসংস্থান হবে সেজ গড়লে। সবই এখন গড় হিসেবের সাপেক্ষে অনুমান। দ্বিতীয়ত, যদি আগের অভিজ্ঞতা ধরি তবে দেখা যাবে যে আশ্বাস ওঁরা দিচ্ছেন তার তুলনায় প্রকৃত কর্মসংস্থান হয়তো সামন্যই হবে। ১৯৮০ তে পাঞ্জাবে পেপসির কথাই ধরুন। এই বহুজাতিক বলেছিল ৫০,০০০ কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু তারপর ১৯৯১ সালে সংসদে প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক জানান যে কোম্পানি ৪৮২ জনকে কাজ দিতে পেরেছে যার মধ্যে ২১০ জন আবার প্রয়োজনীয় দক্ষতার নীচে অবস্থান করছে।

উটকো ঝামেলা এড়াতে এবং

নিজেদের অক্ষমতার কারণে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন পরামর্শদাতা সংস্থা যেমন প্রাইস ওয়াটার হাউস ইত্যাদিদের হাতে বিপুল অর্থের বিনিময়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ পায়। এইসব পরামর্শদাতা সংস্থার আসল কাজ হল উদ্যোগগুলো যাতে সবদিক দিয়ে সরকারি মদত পায় যে বিষয়ে বয়ান তৈরি এবং তার অনুমোদন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও জমি হাতবদল নিয়ে সমস্যা এড়াতে এই সব পরামর্শদাতা সংস্থার সাহায্য নেয়। আর এরাই দুয়েদুয়ে চারের হিসেব মেলায়। অর্থাৎ আপনার যদি পয়সা থাকে তবে এদেশে আপনি যুবরাজের আদর পাবেন।

এইভাবে এখানে সবারই একেবারে স্বর্গসুখ। যদি কোনোভাবে আপনি রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করতে পারেন, তবে আপনি জানবেন যে হাতের কব্জায় সবকিছু। অর্থাৎ আপনি ভবিষ্যতে কী করবেন তার সবকিছুই আপনার পরামর্শদাতা ঠিক করে দেবে। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতে আপনি শিল্প করলে সরকার থেকে আমলা সবই আপনাকে সাহায্য করতে মুখিয়ে আছে। তারা যে কেবল জমি বাছতেই আপনাকে সাহায্য করবে তা নয়, আপনার সুরক্ষার ও নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাই তারা নেবে।

চিনে যে ৬টি সেজ আছে সেগুলো মূল জনবসতিগুলো থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। অনেক তর্কবিতর্কের পর এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো তৈরি হয়েছে। এগুলো সব অর্থেই সরকারি। আর সবগুলোই উপকূল অঞ্চল। চাষ জমি অধিগ্রহণের ঝামেলা এড়াতে এগুলো তৈরি হয়েছে পতিত জমিতে। আমাদের দেশে এইসব ভাবনা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে মোট ৪০০ সেজ ছড়িয়ে আছে। সেজ যদি এত ভালোই হবে তাহলে মনমোহন সিং এর এই প্রস্তাবে সারা বিশ্ব তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে না কেন?

সেজ গড়ে অর্থনৈতিক সফলতা আসবে না একথা রাজনীতিবিদ, শিল্প মালিক, অর্থনীতিবিদ সহ গণ্যমান্যরা সবাই জানেন। এর আসল উদ্দেশ্য অসীম দারিদ্র, ক্ষুধা ও শোষণের মধ্যে ধনীদের কিছু বিলাসকেন্দ্র গড়ে তোলা। যেখান থেকে আশপাশের গরীব গুর্বোদেরকে দেখে চক্ষুশূল মনে হলে তাঁদেরকে ধনীরা অন্য যে কোনো স্থানে বা জাহান্নামে চলে যেতে বলবে। সেজ গড়ে উন্নয়নের নামে শোষণ আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা যার একমাত্র উদাহরণ হতে পারে।

ভাষান্তর : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঋণ স্বীকার : থার্ড ওয়ার্ল্ড রিসার্জেন্স, নং ১৯৭

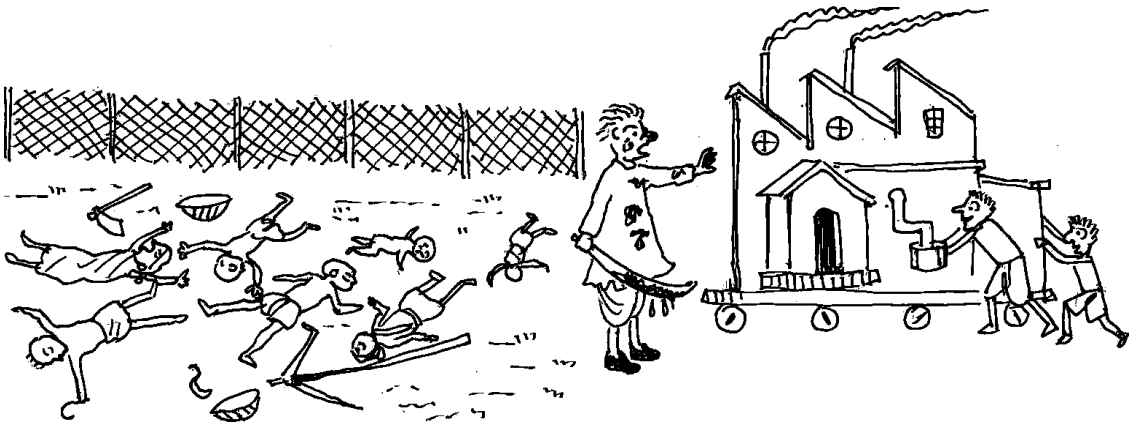

উন্নয়ন ও পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা

তরুণ কুমার দেবনাথ

আজকে পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মতই ভারতেও উন্নয়নের জোয়ার। বার্ষিক অগ্রগতির হার ৮ শতাংশ এবং এই হারকে ১০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে— তবেই নাকি আমরা পৃথিবীর শক্তিশালী দেশের অন্যতম বলে পরিগণিত হবো। এইরকম এক বৃদ্ধির গতি আগামী ১৫ বছর ধরে রাখতে পারলে, আমাদের দেশের দরিদ্র লোকের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও একই কথা। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালে, এই হার ধরে রাখতে কয়েকটি মূল নীতি অনুসরণ করতে হয়, সেগুলি হল- প্রচুর পুঁজি নিবিড় শিল্পায়ন, ক্রমশ শেষ হতে থাকা জৈব জ্বালানি নির্ভরতা, বাজার উন্মুক্ত করে রাখা (যাতে শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানিরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বেচতে পারে), পরিবেশের সুস্থিতিকে বিনষ্ট করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে ন্যায়বিচারহীন উপায়ে শ্রমশক্তি কাজে লাগানো ইত্যাদি। উন্নয়ন কার জন্য এবং কাদের কষ্টের বিনিময়ে, এইসব প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই, উপরোক্ত নীতিগুলির লাগামহীন প্রয়োগের ফলে, সমস্ত জায়গায়ই দেখা যাচ্ছে যে দেশের মুষ্টিমেয় লোকজনই এই ধরনের বৃদ্ধির সুফল ভোগ করছে এবং সাধারণ মানুষ জীবন-জীবিকার চূড়ান্ত অনিশ্চিয়তার ভুগে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। একজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন, যে এই বৃদ্ধি দেশের ০.২ শতাংশ মানুষের জন্য যা এক কুৎসিত রকমের আর্থিক বৈষম্যেরই নামান্তর!

ওপরের রূপরেখার সামাজিক ও আর্থিক দিক নিয়ে এ প্রবন্ধ নয়। আমি আলোচনা করছি প্রচণ্ড ভোগবাদ নির্ভর এই উন্নয়নে পরিবেশকে কীভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে— যার ফলে পরিবেশ তার **সীমাবদ্ধ ক্ষমতার** মধ্যে কিছু মানুষের অপরিসীম চাহিদা ও লোভ নির্ভর

ওয়াশিংটন অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড - ২০০৬-এ প্রকাশিত নীচের টেবিল দেখুন

দেশ/অঞ্চল	জ্বালানির ব্যবহার ২০০৪ (লক্ষ ব্যারেল/দিন)	মাথাপিছু জ্বালানির ব্যবহার ২০০৪ (ব্যারেল/বছর)	কার্বন নির্গমন ২০০৪ (লক্ষ টন)	মাথাপিছু নির্গমন বৃদ্ধি ২০০৪ (টন / বছর)	কার্বন নির্গমন বৃদ্ধি ১৯৯০-২০০৪ (বৃদ্ধি%)	খাদ্যশস্যের ব্যবহার (লক্ষ টন)	মাথাপিছু খাদ্যশস্যের ব্যবহার (কেজি/বছর)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২০৫	২৫.৩	১৬১৬	৫.৫	+ ১৯	২৭১	৯১৮
* ইউরোপ ইউনিয়ন	২৬	১১৯	৯৫৫	২.৫	+ ৬	২৫৬	৫৬১
জাপান	৫৩	১৫.২	৩৩৮	২.৭	+ ২৩	৪৫	৩৫৪
চিন	৬৭	১.৯	১০২১	০.৮	+ ৬৭	৩৮১	২৯২
ভারত	২৬	০.৯	৩০১	০.৩	+ ৮৮	১৮৭	১৭৩

* তেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে জার্মানির হিসাব ধরা হয়েছে

অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে মেনে নিতে পারছে না — তা নিয়ে ।

আগের পাতায় টেবিলের তথ্যগুলি একটু খতিয়ে দেখা যাক -

১) জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি চিনও ভারত আগামী দশকগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক অর্থাৎ জাপানের স্তরেরও পৌঁছায় তবে শুধুমাত্র এই দুটি দেশই জ্বালানি ব্যবহার করবে ১০০০ লক্ষ ব্যারেল প্রতিদিনে (আর সমগ্র বিশ্ব ব্যবহার করবে ২০০০ লক্ষ ব্যারেল প্রতিদিনে) । ২০০৫-এ সারা বিশ্বের মোট জ্বালানির ব্যবহার ছিল ৮৫০ লক্ষ ব্যারেল প্রতিদিনে । ভূতাত্ত্বিকরা অবশ্য বলে রেখেছেন, বিশ্বের মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ ১০০০ লক্ষ ব্যারেল প্রতিদিনে পৌঁছানোর পর কমতে শুরু করবে ।

২) তেলের মতই বিশ্বে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে । কারণ চাহিদা বাড়ছে । এই চাহিদা বাড়ার দুটি কারণ - জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পশুজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি । আয়বৃদ্ধির ফলে চিনের ভোগ (Consumption) যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছাকাছি পৌঁছয়, তবে বিশ্বের বর্তমান খাদ্যশস্য উৎপাদন-এর ৪০ শতাংশ চিনের জন্যই লাগবে ।

৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদক জমির (area) পরিমাণ ১৯০০ বর্গমিটার । সেখানে চিন ও ভারতের এরকম জমির পরিমাণ হল যথাক্রমে ৬০০ ও ৬৫০ বর্গমিটার । বর্তমানে চিন ও ভারতে প্রাপ্তব্য চাষযোগ্য জমির পুরোটাতেই চাষ-আবাদ হচ্ছে । কিন্তু এদুটি দেশে জনসংখ্যা ও শহরের সংখ্যা ও তার আয়তন যেভাবে বাড়ছে তাতে এই জমির পরিমাণ কমবে । অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে যদি ধরে নেওয়া যায় চাষের জমির পরিমাণ কমবে না, তবে শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই ২০২৫ নাগাদ ভারতে জনপ্রতি শস্যখেতের পরিমাণ হবে ৫২০ বর্গমিটার — দেশের নিজস্ব শস্য চাহিদার জন্য যা একেবারেই অপ্রতুল ।

৪) বিশ্বের বর্তমান গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি খুবই অসুবিধাজনক । ১৯৯৬ ও ২০০৩ এর মধ্যে মোট উৎপাদন মোটামুটি একই ছিল । যার ফলে উৎপন্ন দ্রব্য ও মানুষের চাহিদার মধ্যে ফারাক বাড়তে থাকছে । ১৯৯৯ ও ২০০৬ এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শস্য মজুতের পরিমাণ ৬ বছরের মধ্যে ৫ বছরেই কমে গিয়েছিল ।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনসটিটিউটের ওই একই রিপোর্টে, জলের ব্যবহার নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের (২০০৫) সতর্কবাণী- ভারতে জলের অবস্থা 'অত্যন্ত সঙ্কটজনক । ১৯৯০ দশকে ছোট ও স্বল্পমূল্যের শ্যালো পাম্প চালু হওয়ার ফলে মাটির নীচ থেকে যত জল তোলা হয়, তা বৃষ্টির মাধ্যমে পূরণে (recharge) পরিমাণের থেকে অনেক বেশি (শুধু চাষের জন্য বছরে ২০০ ঘন কিলোমিটার জল তোলা হয়, যা কিনা দেশের পূনর্নবীকরণযোগ্য আভ্যন্তরীণ জলসম্পদের ৬ ভাগের এক ভাগের সমান এবং এর একটি ভগ্নাংশই বৃষ্টির মাধ্যমে পূরণ হয় - তুষার শা) । ভারতে চার ভাগের এক ভাগের বেশি এলাকায় চাষ হয় অতিরিক্ত ভূজল উত্তোলন করে । এরসাথে ভারতের শহরগুলির জলের চাহিদা ২০২৫ নাগাদ দ্বিগুণ হবে এবং শিল্পের জন্য জলের চাহিদা হবে তিনগুণ । চিনের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের জোয়ারে প্রতি বছরে ৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি শিল্পের ক্ষুধা মেটাতে ব্যবহার হচ্ছে- শতাংশে হিসেবে যা ওই দেশের ১ শতাংশ চাষের জমির তিনভাগের একভাগ । গত ২৫ বছরে ক্ষতির পরিমাণ দেশের ৭ শতাংশ চাষের জমি । মনে রাখতে হবে ভারতে চাষের জমির উৎপাদন ক্ষমতা — মরুকরণ (desertification), ভূমিক্ষয়, জলজমা ইত্যাদি কারণে কমে যাচ্ছে । ১৯৯৭-এর তথ্যানুযায়ী, আমাদের দেশের ৫০ শতাংশ জমি অল্প হলেও অনুৎপাদক (degraded), যদি কম ক্ষতিগ্রস্ত জমি বাদ দেওয়া হয়, তবে এদেশে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৮শতাংশ । যদি

ভারত ও চিনে এই ধরনের গতি চলতে থাকে এবং সাথে সাথে বিশ্বের শস্যদানার মজুতের পরিমাণ কমতেই থাকে, তবে এক-দু বছরের খারাপ উৎপাদনের জন্য শুধু এই দুই দেশেই নয়, সারা বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতিই ভয়ানক হয়ে উঠবে।

এখন আরো একটু গভীরভাবে বিষয়টি দেখা যাক — পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের হিসাব - ২০০৫ অনুযায়ী উত্তর হচ্ছে, না। মাথিস ওয়াকার্নেগেল একটি হিসেব চালু করেছেন যা পরিচিত 'বাস্তুতন্ত্রের পদচিহ্ন (ecological footprint) নামে। এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বোঝা যায় 'অর্থনৈতিক কাজকর্মে' কতখানি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে এবং তার দ্বারা উদ্ভুত কতখানি বর্জ্য প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হিসেবের একক ধারা হচ্ছে বিশ্ব-হেক্টর (global hectre), যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বাস্তুতন্ত্রের ওপর কতখানি বোঝা চাপাচ্ছে তা বোঝা যায় এবং তুলনাও করা যায়। এই হিসেবের মাধ্যমে বোঝা যায় ওই দেশের অর্থনীতি দেশের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতাকে কতখানি ব্যবহার করছে। যেমন বাস্তুতন্ত্রের পদচিহ্ন বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা চেয়ে বেশি মানে ওই দেশ। ১) নিজের প্রকৃতিদত্ত বানঞ্চল, চাষের জমি এবং অন্যান্য প্রাপ্তব্য প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে বেশি ব্যবহার করছে, ২) দেশের প্রকৃতির নিজস্ব বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতার চেয়ে বেশি নিক্ষেপ (dump) করছে। এটা সম্ভব হয় দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আমদানি ও বর্জ্য দ্রব্যের রফতানির মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন. জাপান, ভারত ও চিন সবাই নিজের দেশের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেদের উন্নয়নের ধ্বজা ওড়াচ্ছে।

নীচের দেশ, অঞ্চলগুলি সারা বিশ্বের মোট বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতার ৭৪শতাংশ ব্যবহার করছে — অর্থাৎ বিশ্বের বাকি দেশগুলির জন্য রইল মাত্র ২৬ শতাংশ। এটা সম্ভব হচ্ছে আফ্রিকা ও অন্যান্য দরিদ্র এলাকাগুলি নিজেদের ক্ষমতার ভগ্নাংশ ব্যবহার করায়। ওয়াকার্নেগেল বলছেন যে সমগ্র বিশ্বের বেলায় এই পদচিহ্নের পরিমাণ মোট ক্ষমতার চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি। বিশ্বের বড় ও সবচেয়ে শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলিতে বন কাটার পরিমাণ বন তৈরির চেয়ে বেশি, মাটির নিজের জল তোলার পরিমাণ পূরণ (recharge) - এর বেশি, পরিবেশ যতখানি কার্বন গ্রহণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি কার্বন নির্গমন করছে।

যদি জনপ্রতি পদচিহ্নের মানগুলি দেখা যায় তবে বোঝা যাচ্ছে ভারত ও চিনের ক্ষেত্রে বিশ্বগড়-এর (২.৩ বিশ্ব-হেক্টর) থেকে কম। অন্যদিকে গড় আমেরিকাবাসী ভোগ (consume) করেন ৯.৭ বিশ্ব হেক্টর। পদচিহ্ন বাড়তে থাকে দেশের শিল্পায়নের সাথে। মাত্র ৪.৫ শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই বিশ্বের ২৫ শতাংশ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা ভোগ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভোগাবাদী ঝোঁক বেড়েই চলেছে (১৯৯২-২০০২) সময়ে বৃদ্ধি ২১

বাস্তুতন্ত্রের পদচিহ্ন (ecological footprint)

দেশ/অঞ্চল	মোট পদচিহ্ন (মিলিয়ন বিশ্ব-হেক্টর)	জনপ্রতি পদচিহ্ন (বিশ্ব-হেক্টর)	পদচিহ্ন/দেশের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা (%)	পৃথিবীর মোট পদচিহ্নের অংশ (%)	পদচিহ্নের বৃদ্ধি (৯২-০২) (%)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪১০	৯.৭	২০৫	২৫	২১
* ইউরোপ ইউনিয়ন	২১৬৪	৪.৭	২০৭	১৯	১৪
জাপান	৫৪৪	৪.৮	৫৫৯	৫	০৬
চিন	২০৪৭	১.৬	২০১	১৮	২৪
ভারত	৭৮৪	০.৮	২১০	৭	১৭
				মোট - ৭৪%	

শতাংশ । এই ধরনের ধ্বংসকারী ঝোঁক চলতে পারেনা । চিন, ভারত, জাপান, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি বাকি বিশ্বের দেশগুলির চাহিদা (aspiration) সুস্থায়ীভাবে চলার জন্য বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষমতা সত্যি সত্যিই পর্যাপ্ত নয় । ভারত ও চিনের মাথাপিছু পদচিহ্ন যদি বর্তমান জাপানের সমান হয়, এই দুটি দেশের জন্যই পুরো পৃথিবীর দরকার হবে ।

সাউথ প্যাসিফিক অ্যাপলায়েড জিও-সায়েন্স কমিশন, ইউএনইপি (UNEP), আরো কয়েকটি সহযোগী সংস্থা মিলে ভঙ্গুরতা সূচক (Vulnerability) তৈরি করেছেন । এই সূচকের সাহায্যে যে কোনো ঘটনাকে বোঝবার জন্য কোনো দেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার (System) মধ্যের ক্ষমতাকে Potential) বোঝায় । এর থেকে বোঝা যায় মানুষ তার পরিবেশের মধ্যে কতখানি সুস্থায়ী (Sustainable) ভাবে বসবাস করছেন । এই সূচক একই সাথে পরীক্ষা করে বলে, বর্তমান অবস্থা ও ঝুঁকি সাথে সাথে পরিবেশ কিভাবে যুঝবে তারও ধারণা দেয় । এই সূচক ৫০টি নির্দেশক (Indicator)-এর ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত ধাক্কার (Shock) জন্য পরিবেশের ভঙ্গুরতা বুঝতে সাহায্য করে । উদ্যোক্তারা আশা করছেন এর সাহায্যে সরকার, আর্থিক সাহায্যকারী সংস্থা ও অন্যান্য সবাই দেশের ভঙ্গুরতা কমাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা নিতে পারবে । নিচের সারণি দেখুন ।

বিংশ শতাব্দীর সম্পদঘন উন্নয়নের পথ এক কানা গলির শেষ প্রান্তে (dead end) এবং সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । আজকে তাই ভাবতেই হবে- বেশিরভাগ মানুষ উন্নয়নের ন্যূনতম ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হবেন, না এমন এক পথ বছাবো যাতে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের স্বাচ্ছন্দ ও সুখের ব্যবস্থা হতে পারে ।

ব্যাখ্যা	মোট দেশ/অঞ্চল	কিছু উল্লেখযোগ্য দেশের নাম
ভালো অবস্থা	১৫	জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, নামিবিয়া, নাইজার, আর্মেনিয়া, মালি ইত্যাদি
ঝুঁকি অবস্থা	৪২	অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা,বলিভিয়া, ভুটান, কানাডা, কেনিয়া ইত্যাদি
ভঙ্গুর	৮০	ইউএসএ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইজিপ্ট, হংকং, ইরান, বার্মা, রাশিয়া ইত্যাদি
খুবই ভঙ্গুর	৬২	বাংলাদেশ, সুইজারল্যান্ড, কিউবা, চিন, জার্মানি, ইরাক দঃ আফ্রিকা ইত্যাদি
অত্যন্ত ভঙ্গুর	৩৫	ভারত, ইজরায়েল, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, ইটালি ইত্যাদি

শেষের কথা - তাহলে কি উন্নয়ন হবে না ? উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন হবে না ? দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি হবে না ? অনেকের মতই আমার কথা নিশ্চয়ই উন্নয়ন করতে হবেই এবং নতুন শিল্প গড়তে হবেই — দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি করতে গেলে এসব করতেই হবে । কিন্তু পথ অন্য হবে- তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হবে কিছুতেই পরিবেশকে ধ্বংস করে কিছু করা যাবে না । উন্নয়ন এর নামে জীবিকাহীন শিল্পায়ন কিছুতেই নয় । মানুষকে বাস্তুচ্যুত ও জীবিকাহীন করে, শুধু অল্প কিছু মানুষের চরম ভোগ-লালসা পূর্ণ করার জন্য শিল্প স্থাপন নয় । যেখানে ইতিমধ্যেই পরিবেশকে ক্ষতি করে শিল্প ও জীবন-যাত্রা চলছে, সেগুলি অনুমোদিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে । নতুন শিল্পের জন্য নীচের তিনটি শর্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে ।

১) তৃণমূল স্তরে জনগোষ্ঠীদের সংগঠনও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংগঠনগুলির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য শুনতে হবে এবং স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও পর্যালোচনা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

২) জীবিকার ক্ষতি এড়াতে ও সুনিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত শিল্প জীবিকার ওপর কতখানি প্রভাব ফেলবে তার সঠিক মূল্যায়ন (Livelihoodm Impact

assessment) করতে হবে।

৩) প্রকৃতি ও মানুষের স্বার্থে যে কোনো শিল্প স্থাপনের আগে, প্রস্তাবিত শিল্প পরিবেশের ওপর কতখানি প্রভাব ফেলবে তার সঠিক মূল্যায়ন চাই (Environmental Impact Asessment)।

বিশ্বের অনেক চিন্তাশীল এই নিয়ে ভেবেছেন, পথ বাৎলেছেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু খুব বেশি প্রয়োগ হয়নি। এর জন্য চাই অন্ধগলির রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। এখন আর সময় নেই, অবশ্যই পশ্চিমী ধাঁচের প্রকৃতি ধ্বংসকারী, চূড়ান্ত অসাম্য সৃষ্টিকারী উন্নয়নের মডেলের জায়গায় সাম্য ও সুস্থায়ী (equitable and sustainable) উন্নয়নের মডেল চাই। এই প্রচেষ্টা শুধু উন্নয়নশীল দেশের জন্যেই জরুরি নয়, উন্নয়নশীল দেশের মানুষ ও সরকারের আশু কর্তব্য।

ফ্রেডরিক এঙ্গলসের কথা মনে রেখেই আমাদের চলতে হবে - মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, এশিয়া মাইনর এবং অন্যান্য জায়গায় যে মানুষ কৃষি উপযোগী জমি পাবার জন্য অরণ্যকে নির্মূল করে দিয়েছিল, তারা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারেনি, অরণ্যের সাথে সাথে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ ও ধারণ করার কেন্দ্রগুলিও নিঃশেষিত করে তারা এই দেশগুলির বর্তমান অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপ এইভাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে, বিজেতা যেমন বিজিত জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, আমরা কোনো অর্থেই সেভাবে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করি না। বরং রক্ত, মাংস, আর মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব। প্রকৃতির ওপর আমাদের সমস্ত প্রভুত্ব এইখানে যে অন্য সমস্ত জীবের থেকে আমাদের সুবিধা — আমরা প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে এবং নির্ভুল প্রয়োগ করতে সক্ষম।

প্রকাশিত হয়েছে

বিনিময় মূল্য : ৪০ টাকা

আপনি হয়তো জানেন, ২০০৫ সালে যুগান্তকারী তথ্যের অধিকার আইন লোকসভায় পাশ হয়েছিল। আমরা এর আগে এই আইন সম্পর্কে ৪টি লেখা প্রকাশ করেছিলাম। এর সাথে সাথে আমরা নিয়মিত তথ্যের অধিকার বিষয়ক নানা নথিপত্র সংগ্রহ করছিলাম - ভবিষ্যতে বাংলায় একটি সংকলন প্রকাশ করার জন্য। কারণ আমরা মনে করি, শুধু কৃষি নয়, সরকারের বিভিন্ন দফতরে যে সব দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা রয়েছে সেগুলি বন্ধ করে, এক দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল সরকার ও প্রশাসন গড়ে তোলায়, সমস্ত নাগরিকের জরুরি ভূমিকা রয়েছে। সংবাদ পরিষেবার পাঠক বা গ্রাহক কেউই এই অধিকারের আওতার বাইরে নন। আর সেজন্যই এই অধিকার প্রয়োগের স্বার্থে, আপনাদের জন্য বর্তমান সংকলনটি। আমাদের আশা, আপনিও সারা দেশের লাখ লাখ মানুষের মতো এই অধিকার প্রয়োগ করবেন। বইটির একাধিক কপি নিলে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ : ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, ৯৪৩৩৫১১১৩৪

ক্ষণিকের অতিথি

সুদীপ দাস

শাল, মহুল, কেন্দ, কুর্চি গাছ আর লাল কাঁকুড়ে মাটি বাকিটা না শুনেই চোখ বুজেই বলে দেওয়া যায় নিশ্চয়ই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা পশ্চিম মেদিনীপুর সম্বন্ধেই কিছু একটা বলা হচ্ছে। ঠিকই, আমি এই এলাকারই এক ক্ষণিকের অতিথির কথাই বলছি, এরা ঠিক কবে, কোথায় আর কখন আসবে সেটা কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই অজানা, মোটামুটি সময় একটা বলা যেতে পারে যে বর্ষার শুরু থেকে শীতের শুরু পর্যন্ত এদের আসা যাওয়া চলতে থাকে। কিন্তু দিন উল্লেখ করাটা কঠিন। আর যখন আসতে শুরু করে তখন দল বেঁধেই আসে এরা বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন রঙের হয়। এদের সম্পর্কে যতটুকু ধারণা আছে তা কেবল মাত্র এই এলাকার ভূমিপুত্র অর্থাৎ সাঁওতাল, শবর..... জাতির লোকেদেরই আছে। আর সেই ধারণাও বংশ পরম্পরা থেকেই চলে আসছে। এই প্রজন্মের কাছে নতুন কোনো তথ্যও নেই।

এই ক্ষণিকের অতিথি হল খাওয়ার উপযোগী ছত্রাক। ছত্রাক হল এক ধরনের অনুন্নত উদ্ভিদ। উদ্ভিদকূলে এদের স্থান ব্যাকটেরিয়ার পরেই। ছত্রাক সাধারণত মৃত এবং পচে যাওয়া জৈববস্তুর ওপরেই জন্মগ্রহণ করে। সব ছত্রাক খাদ্যোপযোগী নয়। অনেক ছত্রাক খেলে শরীর খারাপ করতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। আমি কেবল জঙ্গলের মাটিতে বা শুকনো কাঠে হয় এরকম খাদ্যোপযোগী ছত্রাকের কথাই বলছি। সাধারণত লোকে এদের ছাতু বলে। (ইংরেজিতে একে Wild Edible Mushroom বলে। যার বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায় জংলি খাওয়ার উপযোগী মাশরুম বা ছাতু)। বেশ কিছু জঙ্গলের ছাতুর চাষ পদ্ধতি এযাবৎ উদ্ভাবন করা গেছে এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে এদের চাষ বেশ সফল ভাবেই মানুষ করছে। এরকম একটি পরিচিত ছাতুর নাম হল ঝিনুক মাশরুম। আমি অবশ্য যাদের কথা বলছি তাদের চাষ পদ্ধতি এখনও আমাদের অজানা। শুধু চাষ পদ্ধতি কেন এদের সম্পর্কে সবকিছুই আমাদের অজানা। নভেম্বর মাস থেকে জুন পর্যন্ত কোথায় যে লুকিয়ে থাকে সেটা সবার কাছেই রহস্য। এখানে প্রচণ্ড গরমে তাপমাত্রা ৫০°সেন্টিগ্রেড এর কাছাকাছি উঠে যায় আর শীতে ৮-৯° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নেমে আসে। অর্থাৎ ৮° সেন্টিগ্রেড থেকে ৫০°সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় ওঠানামা করে। আবার ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে শাল জঙ্গলের পড়ে থাকা শুকনো পাতাতে লোকে আগুন ধরিয়ে দেয়, তখন জঙ্গলের তলায় সবুজের একটা কণাও থাকে না। কিন্তু বর্ষা শুরু হলে সবাইকে অবাক করে এই ছাতুরা ফুটতে শুরু করে। পরিযায়ী পাখিদের মত এরা তো আর উড়ে আসে না তাহলে ঠাণ্ডার পরে প্রচন্ড গরমে আর তার সঙ্গে আগুন সব কিছু সহ্য করে জঙ্গলের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব কীভাবে টিকিয়ে রাখে - এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়! বর্ষার অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোর রাতে ফুটতে শুরু করে আর ঠিক মত সূর্যের আলো ফোটার আগেই শেষ হয়ে যায়। হয় মানুষে তোলে নয়তো জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণী এদের খেয়ে

ফেলে। খুব কম সময়ের জন্যই এরা প্রকৃতির বুকে থাকে।

জঙ্গলের কোন ছাতু মানুষে খায় আর কোনটা খায় না এটা সহজে চেনার কোনো লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আমরা এখনও খুঁজে পাইনি। পুরোটাই এই এলাকার ভূমিপুত্রদের কথাই বিশ্বাস করেই চলতে হচ্ছে। এরা যেগুলো বছরের পর বছর খেয়ে আসছে সেগুলোকেই খাদ্যোপযোগী ছত্রাক বলেই আমরা চিহ্নিত করছি। এর বাইরে অনেক ছত্রাকই যাদের জ্ঞানকে পাথেয় করে এগোচ্ছি তারা বলতে পারে, কোন কোন ছাতু খেলে বমি, পায়খানা হয় আর মাথা ঘোরে। এইগুলোকে তারা সাবধানেই এড়িয়ে চলে। কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে খাওয়া যাবে আর কী কী কারণে খাওয়া যাবে না, এরকম কোনো সনাক্তকরণ পদ্ধতি আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা ১৫ ধরনের ছাতু পেয়েছি যেগুলো এই এলাকার মানুষরা খেয়ে থাকে। এই ১৫টির বাইরে কোনো

আমরা যে ১৫ টি ছাতু পেয়েছি তাদের মধ্যে কোনোটি মাটির ১-২ ইঞ্চি তলায় হয় আবার কোনটি উই এর ঢিলার ওপর হয় আবার কোনোটি মাটির প্রায় ১৮-২০ ইঞ্চি তলা থেকে বের হয়। এদের রঙও বিভিন্ন - সাদা, লাল, হলুদ, কালো, খয়েরি। একটা ধারণা ছিল খাওয়ার উপযোগী ছত্রাক কেবল সাদাই হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

এদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছকের মধ্যে দেওয়া হল।

ক্র নং	ছাতুর নাম	কোন সময় হয়	রং	কোথায় হয়	উৎপাদন	বাজারে বিক্রি হলে দাম
০১.	পুটকা	জুন-অগস্ট	কাগজে	মাটির ১-৫ ইঞ্চি তলায়	বেশি	২০-৪০ টাকা কেজি
০২.	মোচাল	জুলাই-অগস্ট	সাদা	মাটির ওপরে	মাঝারি	৪০-৫০ টাকা কেজি
০৩.	বালি (ছোট)	জুলাই- সেপ্টেম্বর	সাদা	মাটির ওপরে	কম	৬০-৮০ টাকা কেজি
০৪.	বালি (বড়)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	সাদা	মাটির ওপরে	কম	৪০-৬০ টাকা কেজি
০৫.	টিলা	”	”	উইয়ের টিলার ওপরে	কম	-
০৬.	বরকনে	জুলাই-অক্টোবর	হলুদ	মাটির ওপরে	কম	-
০৭.	কামার (কালো)	জুলাই-অক্টোবর	কালো	মাটির ওপরে	কম	-
০৮.	পাতরা	জুলাই-অক্টোবর	সাদা	”	কম	-
০৯.	মুরগি	”	লাল	”	”	-
১০.	রাখাল	”	হালকা খয়েরি	”	”	-
১১.	আম	জুন-জুলাই	সাদা	আমের গুড়িতে	”	-
১২.	কামার	জুলাই-অক্টোবর	ধুসর	মাটির ওপরে	”	-
১৩.	* কাড়াঙ	”	সাদা	১৮-২০ ইঞ্চি মাটির তলা থেকে	বেশি বেশি	৪০-১০০ টাকা কেজি -
১৪.	জাম	”	কালচে	মাটির ওপরে	কম	-
১৫.	পোয়াল	জুলাই-অক্টোবর	খয়েরি	খড়ের ওপরে	মাঝারি	৪০-৮০ টাকা কেজি

এই এলাকার জঙ্গলে হয় সেগুলোর মধ্যে কোনটা খাওয়া যায়, কোনটা খাওয়া যায় না, আর কোনটা বিষাক্ত সেটা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে আমরা ছাতু হলে সেটা খাওয়ার উপযোগী নয় বলেই ধরে নিচ্ছি। আমরা এরকম একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছি যা দিয়ে এদের সনাক্ত করা যাবে।

- এদের সঙ্গে উইয়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেকটির তলায় উই থাকে।
- জঙ্গলে হয় না পুরানো খড়ের ওপরেই হয়। যেহেতু এরা নিজের থেকেই হয়

তাই আমরা এদের আমাদের তালিকাভুক্ত করেছি।

জঙ্গলের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের জীবনজীবিকা অনেকটাই জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ভাবে তারা জঙ্গল থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকে। আমরা একটা সমীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে সারাবছর জঙ্গল থেকে কী কী খাদ্য সাধারণত এই এলাকার লোকেরা সংগ্রহ করে থাকে, আমরা যা পেয়েছি তা হল

এর বাজার দরও সবথেকে বেশি।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার কয়েকটি বাজারে সমীক্ষা করে দেখেছি একটি মরশুমে কত ছাতু এই বাজার গুলিতে বিক্রি হয়।

আমরা যা পেয়েছি : -

বাজার	ব্লক	পরিমাণ (কুইন্টাল)
গোপিবল্লভপুর	গোপিবল্লভপুর-১	৮.৫
ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	১১০
বিনপুর	বিনপুর - ১	৬.৫
শিগাদা	বিনপুর - ২	৬
বেলপাহাড়ি	বিনপুর - ২	৯
লালগড়	বিনপুর - ১	৩৩
গিধনী	জাম্বনী	১৬০.৫
পরিহাটি	জাম্বনী	৫

		জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	অগা	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	বাজারে বিক্রি হয় কী	দাম কিলো প্রতি
পাতা	*Rivea hypocrateriformis*													না	-
	Colocasia niphipholia													হ্যাঁ	৪-৫/-
কন্দ	*Dioscorea oppositifolia*														৫-৬/-
	Dioscorea nummularia														৩-৪/-
	Diocorea alata														৪-৫/-
	Asperagus racemosus														৩০-৪০/-
শাক সবজি	*Melothria heterophylla*														৪০-৫০/-
	Momordica cochinchinensis														৫০-৭০/-
	Madhuka indica														৮-১০/-
	Ficus hispids														৪-৫/-
ফল	*Diospyros melanosylon*														১৫-২০/-
	Flacourtia indica														২০-২৫/-
	Phoenix acaulis														৫-৬/-
	Gardenia gumifera														৮-১০/-
	Buchanania lanzan														৪-৬/-
	Syzgium cumini														১২-১৬/-
ফুল	*Holarrhena antidysentrica*														-
	Madhuka indica														৭-৮/-
পুরো গাছ	*Mushroom*														২০-১০০/-

এই তালিকা থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে ছাতুই সব থেকে বেশি সময় ধরে পাওয়া যাচ্ছে আর

ঝাড়গ্রাম আর গিধনী বাজারে ছাতু বিক্রির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ হল বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাতু এনে এখানে জমা হয়। তারপর এখান থেকে ঝাড়খন্ডে চলে যায়। এই ছকে যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে বেশি পরিমাণে ছাতু বিক্রি হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা কারণ আমরা অনেক ছোট বিক্রেতার কাছে পৌঁছাতে পারিনি।

যে জিনিস চাষ করতে হয় না, বীজ পুঁততে হয় না, সার, বিষ কিছুই লাগে না। আপনা থেকেই পাওয়া যায়। শুধু জঙ্গল থেকে তুলে আনতে কিছুটা সময় দিতে হয়। খাদ্য বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে খুব সহজেই বোঝা যায়, এর থেকে বড় প্রকৃতির দান আর নেই। কিন্তু আমাদের দূর্ভাগ্য এখনও পর্যন্ত জঙ্গলের ছাতুর ওপর সেরকম কোনো কাজই করে উঠতে পারিনি আর এর পরিমাণও দিনে দিনে কমছে। পরিমাণ কমার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে

১) প্রাকৃতিক জঙ্গলের পরিমাণ কমছে

২) জঙ্গলে মানুষ গবাদি পশুর যাতায়াত বেড়েছে

৩) অনিয়মিত বৃষ্টিপাত

আমরা আর একটি সমীক্ষা করেছিলাম, জঙ্গলের কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি গ্রামের মানুষের খাওয়ার অভ্যাস জানার জন্য। আমরা যেটা করেছি সেটা হল প্রত্যেকদিন দুবেলা বাড়ির অধিকাংশ লোক (২০০৬-এর ১৯ জুলাই থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত) প্রত্যেকদিন কী কী খেয়েছে তা আমরা জেনেছি। এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা ৮টি গ্রামের ৭০টি পরিবারের কাছে গিয়েছিলাম। মোট ১০৬ দিন অর্থাৎ ২১২ বারে কোন খাবার কত বার খেয়েছে তা ছকের মধ্যে দেওয়া হল : -

খাদ্য	কতবার	শতকরা হার
ডাল	৪৯	২৩.১১
কন্দ	১২৪	৫৮.৪৯
পাতা (শাক)	৬৫	৩০.৬৬
সবজি	৮৩	৩৯.১৫
প্রাণীজ প্রোটিন	৫৫	২৫.৯৪
ছাতু	৮৮	৪১.৫০

ভাত বা রুটির সঙ্গে এই খাবারগুলি মানুষেরা খেয়েছে। এই তালিকা থেকেও বোঝা যাচ্ছে এই এলাকার মানুষ ছাতুকে কতখানি গ্রহণ করেছে।

ছাতুর পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এত সহজে আমরা এরকম একটা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছি, কিন্তু এটা এখনও প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা চাইলেও জঙ্গলের ছাতু পাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রকৃতি দিচ্ছে। শুধু পুষ্টিকর খাবারই নয়, এই এলাকায় মানুষের ৫-৬ মাসের রোজগারও হয় এই ছাতু বিক্রি করে।

আমরা চেষ্টা করছি এই পুষ্টিকর খাবারটিকে কোনোভাবে সংরক্ষণ করে আরও বেশিদিন ধরে খাওয়া যায় কিনা বা কৃত্রিমভাবে চাষ করে এর উৎপাদন বাড়ানো যায় কিনা। এতে মানুষের আয় করার একটা সুযোগও বাড়বে আর পুষ্টির চাহিদাও অনেকটা মিটবে। যদি আমরা এই ক্ষণিকের অতিথিকে আমাদের পরিবারের একজন করে তুলতে পারি তাহলে এই লাল মাটির দেশের অনেকের মুখেই হাসি ফোটাতে পারবো।